# অমৃতের স্বাদ

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

**সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-**
চপল মিত্র

**সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-**
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

**প্রথম প্রকাশ ঃ-**
শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
ইং ২১শে অক্টোবর, ২০০৬

**মুদ্রণে ঃ-**
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

**প্রাপ্তিস্থান ঃ-**
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

# মুখবন্ধ

প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করেছেন জীবের ভিতর দিয়ে; অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিনব সৃষ্টিতে কেউ কীট, কেউ পতঙ্গ, কেউ পশু, কেউ পক্ষী, কেউ বা আবার মানুষ। তাঁরই সৃষ্ট জীব আমরা সবাই। এই সকল জীবের মধ্যে আবার মানুষকেই নাকি শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়। কারণ একমাত্র মানুষই তার বিচার শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং বিবেচনা শক্তিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

আমরা বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ করে জানতে পারি, দেবতারা অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁরা কি শুধু অমৃত পান করেই দেবতা হয়েছেন? একথা বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন (মানুষ) হয়ে কি মানা যায়? না তাঁরা তাঁদের কর্মধারার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন? আজ আমরা যাঁদের দেবতা বলছি, তাঁরা একদিন এই ধরাতলে আমাদের মতই ছিলেন। আমাদের চারিদিকে আল্লা, গড, দেবতা যাঁরা, যাঁরা আমাদের আরাধ্য এবং পূজ্য, তাঁরা অনেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, মারপিট করে দেবতা হয়েছেন। অর্থাৎ অসুরের বিরুদ্ধে সুর প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁরা অস্ত্রধারণ করেছেন (বুঝের জায়গায় বুঝ, লাঠির জায়গায় লাঠি প্রয়োগ করেছেন)।

অমৃত কি, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নেই বা সে সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। কিন্তু জ্ঞানামৃত অর্থাৎ জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সপ্তসুরে (সপ্তচক্রে) তাঁরা (দেবতারা) প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই আজ তাঁরা অমর। সুতরাং তাঁরা যদি অমরত্ব লাভ করতে পারেন, তবে তাঁদেরই সৃষ্ট জীব হয়ে আমরা কেন অমরত্ব লাভ করতে পারবো না? অজ্ঞানতার তমসার আঁধার থেকে জ্ঞান সূর্য প্রজ্বলিত করে, সেই প্রজ্বলিত আলোয় নিজ নিজ দেহবীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার তুলে, প্রকৃতির তত্ত্বামৃত পাঠ করে আমরাও (মানুষ) একদিন অমর হবোই হবো।

দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতারা অসুরদের হস্তে পরাজিত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। অবশেষে তাঁরা ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তাঁদের সমুদ্র মন্থন করতে পরামর্শ দিলেন। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে তীব্র হলাহল (বিষ) উঠেছিল, নীলকণ্ঠ মহাদেব সেই সমস্ত বিষ পান করে পৃথিবীকে রক্ষা করলেন। অবশেষে সমুদ্রের গর্ভ হতে অমৃতের পূর্ণকুম্ভ উঠে এল। দেবতারা সেই অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করলেন। নীলকণ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেবই সমস্ত বিষ (অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা) নিজ কণ্ঠে ধারণ করে দেবতাদের অমৃতের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছিলেন।

জ্ঞানামৃতের স্বাদ আমরাও যাতে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করতে পারি, তারই জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপবাদকে বাহন করে কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনো বা বিভিন্ন মীটিং ও ধর্মসভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব বিভিন্ন সময় শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই বেদতত্ত্ব শ্রুতিলিখন, পাণ্ডুলিপি ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণ আকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত) ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব. তিনি অর্পণ করেছেন। তারজন্য একটি সংকলন (প্রকাশন) বিভাগও গঠন করে শ্রীশ্রীঠাকুর নাম দিয়েছেন **অভিনব দর্শন**।

অভিনব দর্শন প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি (পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর) তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়ে. দ্বাদশ শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল **অমৃতের স্বাদ**।

পরিশেষে পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অর্নিবাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতি নীহার দাস। এছাড়া যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন, তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩ — *চপল মিত্র*

ইং ২১শে অক্টোবর, ২০০৬ — *(প্রকাশক, সংকলক ও সংগ্রাহক)*

# দৃষ্টির বাইরে নিরাকার। আকারবিহীন নিরাকার নয়, অদৃষ্ট নয়।

**পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা**
**২৭-০৬-১৯৬৪**

আমাদের এই যে জন্ম-জন্মান্তর, আবহমান কাল হতে এই যে পরিবর্তন, রূপে রূপে রূপান্তরের মাঝে এই যে ধারাবাহিকতার ধারা, তার ব্যাখ্যা বিরাট। বিরাট রহস্যের মাঝেই এই জন্ম। শাস্ত্রে আছে বারবার জন্ম হয় আমাদের কর্ম অনুযায়ী। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সবার বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি কেন এই জন্ম? শাস্ত্রে আছে সবটাই সাধনা সাপেক্ষ। সাধনার উপরেই বেশী নির্ভর করছে। সাধনা করে যতদিন পর্যন্ত ভিতরকার সাধনার যন্ত্রগুলির স্ফূরণ না হয়, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেই হবে। তাই বারবার পরিবর্তনের মাঝে চলছে। সুতরাং সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সমাধানে এখনও পৌঁছনো সম্ভব হয় নাই। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের উপর, পূর্বাপর মহানদের উপর নির্ভর করেই চলছে। আমরা গতির মাঝে থেকে যাচ্ছি। কিন্তু যদি সমাধানে আসা যেত, সবটা যদি মানা যেত, তাহলে এই পৃথিবীতে অত্যাচার, দুরাচার, অন্যায় বলে কিছু থাকতো না। সব এক হয়ে যেত। সেইখানেই সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে বিবাদ, বিচ্ছেদ চলছে। বিভক্তের মূলেই আছে জানবার ভুল, বুঝবার ভুল। ঐ ত্রুটির সমাধান হচ্ছে যদি প্রত্যক্ষভাবে বুঝে নেওয়া যায়, তবেই হয়।

শাস্ত্রে আছে বারবার জন্ম হয় আমাদের কর্ম অনুযায়ী। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সবার বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি কেন এই জন্ম? শাস্ত্রে আছে সবটাই সাধনা সাপেক্ষ। সাধনার উপরেই বেশী নির্ভর করছে। সাধনা করে যতদিন পর্যন্ত ভিতরকার সাধনার যন্ত্রগুলির স্ফূরণ না হয়, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতেই হবে।



সেইটারই অভাব। বুঝবার চেষ্টা চলছে না। বুঝবার সুযোগ সুবিধা হচ্ছে না। কাজেই ভয়ভীতি বা নানারকম অবস্থার পরিবেশে সব মেনে নিতে হয়।

ভগবান কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি কোথায় আছেন? কিভাবে আছেন? বুঝা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে শাস্ত্রের যে উক্তি, তাতে সেই ভগবানের খোঁজ কে জানে কেহ বুঝতে পারছে না। অজানার উপর ভগবানকে ডাকা, না জেনে ডাকা আর জেনে ভগবানকে ডাকা, অনেক তফাৎ। মনে প্রাণে যদি বুঝি 'ভগবান আছেন', এই একটি কথা যদি ভিতর থেকে সাড়া দেয় 'ভগবান আছেন', সকলের মনের সহজ সরল স্বীকৃতি যদি থাকে, তবেই সমাধান হয়। 'ভগবান আছেন' বা 'নেই' কোনটাই সঠিকভাবে বলতে পারছে না। কাজেই সব গণ্ডগোল। এর জন্যই দুর্দিন। 'ভগবান' সম্পর্কে যে যা খুশী বলে যাচ্ছে; কারণ ফলাফল বুঝতে পারছে না। কিন্তু সাথে সাথে ফলাফল বুঝতে পারলে যার যার খুশীমত কাজ কেহ করতে পারতো না। তাই দেখতে পাচ্ছি, নিজ নিজ খুশীমত নানারকম নীতিবাদ, যে যার খুশীমত তার কৌশল, তার মত সব চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বুঝতে পারছে না। সূর্য, পৃথিবী নিয়ে তো কেহ মারামারি করে না, চাঁদ নিয়ে তো কেহ মারামারি করে না। তাহলে আমাদের কি পথ?

আজ আমি ভক্তকে বললাম, 'ভগবান আছেন'। তাতে কি হলো? ভক্ত বিশ্বাস করলো। ঠাকুর যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু অন্তরে কিভাবে বিশ্বাস করানো যায়? অনেকে বাবার দাদুকে, সেই দাদুর বাবাকে দেখে নাই। বিলেতে যায় নাই, দেখে নাই। তাহলেও বিশ্বাস করে। কারণ আমি যখন আছি, আমার বাবা যখন আছেন, তার বাবা, তার বাবাও ছিলেন, এটাই বিশ্বাস করি। কাজেই না দেখলেও প্রত্যক্ষ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে অনেক কিছু বুঝানো যায়। জানি মৃত্যু আছে,

জানি মৃত্যু আছে, তবুও মনের কোণে গেঁথে যায় না। 'আমি মরবো', এই বোধটা পাকা হলেও অনেকটা হতো। মৃত্যু চোখের সামনে দেখছে আর বলছে, 'ওতো আমাদেরও মরতে হবে।'

তবুও মনের কোণে গেঁথে যায় না। 'আমি মরবো', এই বোধটা পাকা হলেও অনেকটা হতো। মৃত্যু চোখের সামনে দেখছে আর বলছে, 'ওতো আমাদেরও মরতে হবে।' এটা যেন খেলার সামগ্রী হয়ে যাচ্ছে। কথাটা যেন গল্পগুচ্ছের মত হয়ে যাচ্ছে। ১৪৪ ধারা জারী করলে, মনে যতটা গাঁথা থাকে, 'ওখানে গেলে গুলি করবে', কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা ততটা গুরুত্ব আরোপ করি না। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়লে যেমন মনে ভয় থাকে, এই বুঝি চেকার এল; ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে একবার এদিক, একবার ওদিক করতে করতে চুল পেকে যাওয়ার অবস্থা হয়। একটা অসুখ হলে বা কোন বিপদ উপস্থিত হলে যে রকম গুরুত্ব আসে, মৃত্যু সম্বন্ধে জানা থাকলেও সেরকম গুরুত্ব আসে না। 'আমরা মরে যাব, ছাই হয়ে যাব', জেনে, দেখেও যদি সেটা বিশ্বাস না হয়, মনে প্রাণে গেঁথে না যায়, তবে ভগবান দেখেও তো বুঝবে না। সৃষ্টির সব জিনিস দেখেও তো বিশ্বাস হচ্ছে না। চাঁদ উঠছে, সূর্য দেখছো। দেখেও তা মনে গাঁথছে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সব হয়ে যাচ্ছে। দেখে শুনেও তো মনের গভীরে পিনের (বিবেকের) খোঁচা দিচ্ছে না। ক্ষুধা লাগলে বা দৈহিক বৃত্তির নিবৃত্তি হলে যেমন সন্তুষ্ট হয়, সেরকম তো অন্যান্য ক্ষেত্রে হয় না। এই সৃষ্টির এতবড় সাগর, ভগবানের কি লীলা, দেখেশুনে 'বাঃ' বললো। কিন্তু ধুয়া খেতে খেতে ধোঁয়ার মত ফুৎকারে উড়ে গেল। তারচেয়ে বেশী মনে গাঁথলো না।

এই সৃষ্টির এতবড় সাগর, ভগবানের কি লীলা, দেখেশুনে 'বাঃ' বললো। কিন্তু ধুয়া খেতে খেতে ধোঁয়ার মত ফুৎকারে উড়ে গেল। তারচেয়ে বেশী মনে গাঁথলো না।

যদি নৌকার উপর থাকতে, নৌকা যখন ডোবে, তখন কি অবস্থা হয়, বুঝতে পারতে। আমি যে লঞ্চের কথা বলেছিলাম, সেই লঞ্চের ঢেউ উঠছে একতলা, দোতলার সমান। সেই ঢেউয়ে লঞ্চের উপর দিয়ে জল চলে যাচ্ছে। ১৫০ জন লোক লঞ্চের মধ্যে। ঢেউ যে উথাল-পাথাল, কারো কিছু জ্ঞান নাই। একজন 'হা ভগবান', একজন 'আল্লা হো আকবর', আর একজন ইষ্ট নাম জোরে জোরে উচ্চারণ করছে। কেহ আবার শতনাম করছে। কোন নাম বাকি রাখছে না। কেহ সোনার গহনা ফেলে দিচ্ছে। সে এক



অদ্ভুত, বীভৎস দৃশ্য। আমি ছিলাম সেখানে। মাসিমা ডালের বড়ি ও নীল দিয়েছিলেন। জলে পকেটের নীচ থেকে সব নীল হয়ে গেছে। সামনে ছিল ডালের বড়ি। মাসিমা বলে দিয়েছিলেন, 'তোমার মা ভালবাসে, দিয়ে দিও'। আমি সেকথা বলতে, ডালের বড়ি আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে, তারা আমাকে বলে, 'আপনি মানুষ না কি? 'আপনি ভগবানের নাম টাম কিছু করছেন না?'

আমি বলি, আপনারা তো সবার নামই করছেন। গণেশ, কার্ত্তিক পর্যন্ত গেছেন। বাকী রয়েছে অসুর আর সিংহ। ওদের ডাকাডাকি করে কিছু লাভ হবে কি?

ব্যাপারটা হচ্ছে, যে আমার সঙ্গে আলাপ করছে, সে আমার নাম জানতো। কিন্তু আমাকে চিনতো না। তখন কি অবস্থা। কারোর কাপড় চোপড়ের ঠিক নাই। আমি দেখি, সবার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে। কারোর দিকে কারও খেয়াল নাই। বিপদ ঘন্টি বাজাচ্ছে। এর মধ্যে একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। সাথে সাথে পায়ের মধ্যে পড়ে বলছে, 'গোঁসাই, তুমি এখানে থাকতে আমাদের বিপদ হতে পারে না। আমাদের রক্ষা কর।' সবাই এসে পায়ে পড়লো। অনেকে আবার আমার বিভূতি টিভূতি দেখেছে। তারপর নদী থেকে একটু জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলাম। সাঁৎ করে ঝড় থেমে গেল। নদী শান্ত হয়ে গেছে। একটু পরেই রোদ উঠলো। ১৩৩৬ সনের ঝড়ের গল্প। সকলের কি অবস্থা, আর আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ডালের বড়ি'। সব ডাক একত্র হলেই সাড়া দেয়।

তাই বলছি, মনের একাগ্রতায় কি না হয়? অত বিরাট ঝড়, সেও থেমে গেল। ঝড় যে শক্তিতে আসে, তোমার মনের জোর সেই শক্তিতে গেলে ঝড় কমবেই। যে কোন শক্তির প্রভাবে জল ঘোলাটে হয়, যে কোন কারণে বাতাসে, আগুনে, সূর্যে, অনুপরমাণুতে মেঘ হয়। কেন বাতাস এলো,

মনের একাগ্রতায় কি না হয়? অত বিরাট ঝড়, সেও থেমে গেল। ঝড় যে শক্তিতে আসে, তোমার মনের জোর সেই শক্তিতে গেলে ঝড় কমবেই।

কেন সূর্য উঠলো (পূর্বদিকে) আবার কেনই বা নীচে (পশ্চিমে) নামলো? কোন্ প্রয়োজনে? কোন্ প্রয়োজনের প্রয়োজনে? যারা Economics পড়ায় তারা জানে, প্রয়োজনের তাগিদে তাগিদেই একটা করে নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়। এই যে সূর্য জল নিয়ে গেল। আবার মেঘ হলো, বৃষ্টি পড়লো, শিলা পড়লো। নিদাঘের রাগে জল উপরে যাবার সময় তো দেখা যায় না। আবার উপরে (আকাশে) এত জল যে জমে আছে, তাও তো বুঝা যায় না। এটাই হলো অনিমা, লঘিমা শক্তি। যাওয়ার সময় যে দেখা যায় না, এইটা অনিমা। বরফটা যাওয়ার সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার অজস্র খণ্ড খণ্ড রূপে পড়ে গেল। জগতের রূপ সব শিলার মত রূপ। আমাদের জগতে মেঘের ঘর্ষণে ঘর্ষণে অদৃশ্য আকারে গর্জন যখন হয় এবং বিদ্যুতের চমকানির সাথে ও শব্দের সংঘর্ষণের ফলে যে শিলা বৃষ্টির উৎপত্তি হয়, এই সংঘর্ষই মন্ত্র। এই নিনাদের মন্ত্রে ও তার সঙ্গে যোগাযোগে নানারূপের সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্রহ, উপগ্রহ বরফের মত সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই সৃষ্টি ছিল একদিন অদৃশ্যের ভিতর। সমস্ত বিশ্বের (ব্রহ্মাণ্ডের) অজস্র চৈতন্য কণিকার মধ্যে এই জগতের রূপ অদৃশ্যের মাঝে ছিল। ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রয়োজনে এই আকার নিল। সমশক্তির সমটানে আপনি স্ফূরণ হ'ল। বিভিন্নরূপে বিভিন্ন আকারে আকার নিয়ে আবার নিরাকারে অদৃশ্য হলো। আবার নিরাকার হয়ে চলে গেল। কিন্তু নিরাকারেও অদৃশ্যরূপে আকার থাকে। আকারবিহীন নিরাকার নয়, অদৃষ্ট নয়। দৃষ্টির বাইরে নিরাকার; নিরাকারের একটা আকার থাকে। বস্তুর বস্তুত্ব থেকে যায়। বস্তু দৃষ্টির বাইরে গেলেও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল অদৃষ্ট আকারে। দৃষ্টিতে এল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, এই মৃণ্ময় পৃথিবী। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

দৃষ্টির বাইরে নিরাকার; নিরাকারের একটা আকার থাকে। বস্তুর বস্তুত্ব থেকে যায়। বস্তু দৃষ্টির বাইরে গেলেও বস্তুর অস্তিত্ব ছিল অদৃষ্ট আকারে।

মেঘের গর্জনে গুম গুম যে শব্দ, অকারণ নয়। বৃথা কারণে বা অকারণে কখনও শব্দ হয় না। বিশ্বের চমকানির মাঝে, সেই যে বিদ্যুতের চমকানি, সেটিও রূপ। রূপ নিল কেন? মাটি ফেটে যায় এরকম রেখায়,



সেটাও মাটির রূপ। বিদ্যুতের চমকানিতে অজস্র ফাটাফাটি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি দাগে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য রয়েছে। কেমনভাবে রয়েছে, না হস্তরেখার ন্যায়। আকাশের গায়ে যে বিদ্যুতের চমকানি হয়ে যাচ্ছে, ঐ চমকানির মধ্যে বিশ্বের বার্তা আছে। এই হস্তরেখাও বিদ্যুতের ন্যায়। গ্রামোফোনের রেকর্ড পিনের খোঁচায় যেমন বেজে ওঠে, তোমাদের বার্ত্তাও বেজে উঠবে। ঐ রেকর্ডের থালায় বিস্কুটও খাওয়া যায়। কে বলবে ওর (রেকর্ডের) মধ্যে এত গান? কে বুঝবে এই রেকর্ড-এর থালায় বিশ্বের সমস্ত বার্তা আছে? কিছুটা আবিষ্কার হয়েছে, আবার কিছুটা অব্যবহারের ফলে নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সত্যকারের সত্যরূপের মধ্যে যদি পিনের খোঁচা দেওয়া যায়, তবে বলবে কোথায় ছিলে? প্রতি শব্দের অর্থ আছে। অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে। অনেক সুর রয়েছে সৃষ্টির মধ্যে। Cement বা মাটি ফেটে গেলে অনেক রেখার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি দাগে কথা আছে, symmetry (সামঞ্জস্য) আছে, যোগাযোগ আছে। গাছের দাগগুলির প্রতিরেখাতে কথা আছে। পাতার শিরা উপশিরায় কথা আছে। প্রতি মাত্রায় মাত্রায় কথা থাকে। কিন্তু চোখে আমরা পাতাই দেখি, মাটিই দেখি। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, জল যখন পড়ে, গাছ জল পেলেই ফোঁপাইয়া ওঠে। জলের সঙ্গে গাছের, মাটির সম্পর্ক আছে। কাজেই সম্পর্ক ছাড়া যোগাযোগ থাকতে পারে না। কাজেই মাটির সঙ্গে বাতাসের, বাতাসের সঙ্গে সূর্যের যোগাযোগ আছে। সৃষ্টির সাথে সাথে আমরা এমন যোগাযোগে যুক্ত যে, প্রতি বস্তুতে বস্তুতে আমাদের কথা আছে, বিদ্যুৎ চমকানিতে আমাদের কথা আছে। প্রতি শিরা উপশিরায় আমাদের কথা আছে। শিকড়ে বাকলায় (খোসায়) আমাদের কথা আছে। সমাধানের যন্ত্র প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে এবং তাহাই মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি জীবের সৃষ্টির রহস্য জানা থাকলে প্রতিটি পাতাই অমূল্য। আমার কথা, বিশ্বের বার্ত্তা সব কিছু এখানে সাজানো আছে। এই শব্দ গুরু গম্ভীর। এই শব্দকে আশ্রয় করেই যেতে হবে। এই শব্দই মন্ত্র, এই শব্দই বেদ।

Cement বা মাটি ফেটে গেলে অনেক রেখার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি দাগের কথা আছে, symmetry (সামঞ্জস্য) আছে, যোগাযোগ আছে। গাছের দাগগুলির প্রতিরেখাতে কথা আছে। পাতার শিরা উপশিরায় কথা আছে। প্রতি মাত্রায় মাত্রায় কথা থাকে।

বাচ্চা শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হল, তখন ওঁয়া ওঁয়া করে সৃষ্টি হল। এই ওঁয়াই হচ্ছে মন্ত্র। এই ওঁয়ার মধ্যেই রয়েছে ওঁঙ্কার ধ্বনি। ভগবানকে পাওয়ার জন্য কল্পনার মধ্যে যেতে হবে না। সবচেয়ে সহজ ভগবানকে ডাকা এবং তাঁর সঙ্গে মিশে থাকা; সাগরের পাড়ে থেকে সাগরকে দেখতে পাওয়া যেমন সহজ, ঠিক তেমনই। এতটুকু চক্ষু দিয়ে যদি অসীমকে দেখা যায়, তবে এই মন (universal seed) দিয়ে অনন্ত বিশ্বের রহস্যকে জানা যাবে না কেন? আমাদের এই বিশ্বের সৃষ্টির সকল সমাধান রয়েছে আমাদের দেহবীণাযন্ত্রে (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারে)। আমাদের মাঝে অজ্ঞতার কিছু রেশ পড়ে গেছে। তাই জানতে পারছি না। এইভাবে ছানির সৃষ্টি করলাম। আমরা বাচ্চা বয়স থেকে শিখেছি, ভগবানকে পাওয়া কি সহজ? কাজেই সিংহ ভেড়া হয়ে গেল। কিন্তু সিংহত্ব এতটুকু নষ্ট হয় নাই। এখন কুকুর দেখে পালায়। কারণ সিংহতো জানে না 'আমার রূপ অনন্ত'। সিংহ দুধ খেতে যায়। সে তো জানে, আমার (সিংহের) বাবা, মা দুধ খায়। সিংহ টের পেল কখন? ভেড়ার গায়ে খোঁচা লেগে যে রক্ত বের হয়ে এল, সেটা চাটবার পরেই; হঠাৎ রক্তের স্বাদেই সে বুঝতে পারলো। রক্তই তার মন্ত্র হয়ে গেল।

এতটুকু চক্ষু দিয়ে যদি অসীমকে দেখা যায়, তবে এই মন (universal seed) দিয়ে অনন্ত বিশ্বের রহস্যকে জানা যাবে না কেন? আমাদের এই বিশ্বের সৃষ্টির সকল সমাধান রয়েছে আমাদের দেহবীণাযন্ত্রে।

আমরা সবাই ভেড়ার দলভুক্ত হয়ে গেছি। কাজেই ব্রহ্মত্বটা আজও আমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়নি। সেই রক্তবীজ, রক্তকণিকার স্বাদ, আজও আমাদের জ্ঞাতে (জানার মাঝে) আসে নাই। তাই বলে, আমাদের ব্রহ্মত্ব, সিংহত্ব আজও নষ্ট হয় নাই। আছে সবই, তবে লুকিয়ে আছে, গুটিয়ে আছে। এই মন্ত্রই সেই রক্তের স্বাদের ভাষা। এই মন্ত্র যখন ফাটবে তখন দেখবে, তোমাদের মধ্যে ব্রহ্মের, ব্রহ্মত্বের সুর বিরাটের সুরে যোগাযোগসূত্রে বাঁধা। তোমরা শুধু

আমরা সবাই ভেড়ার দলভুক্ত হয়ে গেছি। কাজেই ব্রহ্মত্বটা আজও আমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়নি। সেই রক্তবীজ, রক্তকণিকার স্বাদ, আজও আমাদের জ্ঞাতে (জানার মাঝে) আসে নাই।



আংশিক ক্ষেত্রে বড় নও। সর্ববিষয়বস্তু সংমিশ্রণের মিশ্রণে তোমাদের জন্ম। প্রত্যেকটির মধ্যে সব গাঁথা আছে, সব বার্ত্তা একাকার হয়ে আছে। এই বার্ত্তা (বিরাটের বার্ত্তা) জানলেই সব বার্ত্তা জানবে, সব বুঝিয়ে দেবে। অবস্থার পরিচাপে আমরা ভেড়ার দলভুক্ত হয়ে আছি।

গুরুগম্ভীর নিনাদের সুর ধরে যেতে হবে আমাদের। জানতে হবে, কেন এই সৃষ্টি? কেন এই সূর্য, কেন এই চন্দ্র? সৃষ্টির প্রত্যেকটির কারণ জিজ্ঞাসা করবে, সৃষ্টির এমনই নিয়ম। বারবার জিজ্ঞাসা করতে করতে আপনি জানবে। আপনি স্ফূরণ হয়ে যাবে। যেমন আগুন লাগলে বাতাস এসে পূরণ করে, তেমনিভাবে স্ফূরণ হবেই। ভাঙ্গলে জোড়া লাগবেই, এটাই নিয়ম। কোন কিছু অপূরণ থাকতে পারে না। কাজেই বারবার জিজ্ঞাসা কর, নিজের মধ্যে ডুবে যাও। মগ্ন হয়ে যাও, তুমি তোমার মধ্যে। বারবার জিজ্ঞাসা কর, কেন এই সূর্য, কেন এই পৃথিবী? কেন এই সৃষ্টি, কি তার উদ্দেশ্য? আর এই মন্ত্র যে পেয়েছো, শব্দই এমনই সুর তোমাকে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেবে। আমরা হাজার দশেক শব্দে মিশ্রিত হয়ে আছি বলে কেহ কিছু পাই না। আমরা হাজার রকম চিন্তাধারায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াই। কাজেই একটি শব্দে দিনের পর দিন ডুবে থাকলে আপনি ফুটে উঠবে। আজও সেই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভার মত সূর্যের মধ্যে সমস্ত ধাতু গলিত অবস্থায় টগবগ করছে, ধূমধাম করে উঠছে আর পড়ছে। দুইশো, চারশো মাইল উপর হতে এক একটি বুদ্বুদ পড়ছে। সেই আলোতে এত আলো, এত তাপ সৃষ্টি হচ্ছে যে, তার থেকে অনবরত সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই পৃথিবী তার (সূর্যের) সৃষ্টি। আমরা এই পৃথিবীর সৃষ্টি। আমাদের ভিতরেও তাই সেই আগুন রয়েছে মূলাধারে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে। সহস্রারে সহস্র সূর্যের মত তেজ নিয়ে বের হবেই। কারণ যা হতে সৃষ্টি, সেটাই বের হবে। আমাদের সেই সাধনা করতে হবে। সেই অগ্নির স্ফূরণ হবার জন্যই আমাদের সাধনা, আমাদের চর্চা, আমাদের মূলমন্ত্রের সাধনা। জগতের সব রূপ নিয়ে

আমরা হাজার দশেক শব্দে মিশ্রিত হয়ে আছি বলে কেহ কিছু পাই না। আমরা হাজার রকম চিন্তাধারায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াই। কাজেই একটি শব্দে দিনের পর দিন ডুবে থাকলে আপনি ফুটে উঠবে।

নিজরূপের সঙ্গে মিশিয়ে সাধনা করতে হবে।

অগণিত বিশ্বের সৃষ্টির ক্ষমতা এক একটা বীজে রয়েছে, শুধুই স্ফূরণের অপেক্ষায়। গুরু কি করেন? এই মন্ত্র দান করেন, 'ধরো আর ছাড়'। 'দেখতে পাও' আচ্ছা; 'না পাও' আচ্ছা। অনুভুতি হোক বা না হোক, শুধু মনন করে স্মরণ করে যাও। আর ভেবে যাও, এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি বীজ হয়ে রয়েছি। অহর্নিশ কাজ করে যাও, আপনি রেকর্ডের মত বেজে উঠবে। তোমার রেকর্ডের কণিকার মধ্যে যে শিরা উপশিরার coil বাঁধা আছে, তা দিয়ে পৃথিবীকে কয়েক প্যাঁচ দেওয়া যায়। কাজেই যে সুর বাজাবে, সেই সুরই তোমাকে guide করে নিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত তার ভাব। চিদানন্দ, ব্রহ্মানন্দের কথা শুনেছ। এর আভাষ এখানে পাচ্ছ। বিশ্বের মহাসুরে উন্মাদ হয়ে যাবে। মূলাধার হতে সহস্রারে, সে যে কি আনন্দের ঢেউ। তোমার দেহবীণাযন্ত্রে বেজে উঠবে, জেগে উঠবে সেই সুর। তুমি শুধু 'বাঃ' করবে। সেই আনন্দ আখ্যায় ব্যাখ্যায় আনা যায় না। শুধু দিনরাত ভাববে, তোমার এই দেহবীণাযন্ত্রে আছে সব সুর। তুমি তোমাকে খুঁজলে সব পাবে। মন্ত্রতন্ত্র তোমার মধ্যেই। এই মন্ত্রকে জাগালে সব জেগে উঠবে। গুরু শুধু জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন, তুমি বীজ আকারে রয়েছ। তুমি তোমার কাজ করে যাও। আপনি স্ফূরণ হবে। বাজবে তোমার দেহবীণাযন্ত্র।

অগণিত বিশ্বের সৃষ্টির ক্ষমতা এক একটা বীজে রয়েছে, শুধুই স্ফূরণের অপেক্ষায়। গুরু কি করেন? এই মন্ত্র দান করেন, 'ধরো আর ছাড়'।

আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# আমরা প্রত্যেকেই এক একটি বেদ এক একটি গ্রহ উপগ্রহ হয়ে রয়েছি

**শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা**
**২১-০৫-১৯৬০**

সহজ করে বলছি, তোমার ভিতর হ'তে, অনাহত হতে একটা ধ্বনি হ'ল, চিরদিন এই শব্দটা থেকে যাচ্ছে মহাশূন্যে। *'শব্দগুণকম্ আকাশম্।' আকাশের গুণই হচ্ছে শব্দ বা ধ্বনি। যেমন এপার হতে ওপারে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় ঠিক তেমনই। যে কোন কথা যেটা বলা হয়, চিরন্তন থেকে যাচ্ছে। এই যে কথা বলার সাথে সাথে মুহূর্ত্তে যেটা শুনছো মনে হয়; সাথে সাথে শুনছো মনে হলেও তা কিন্তু নয়। একটু সময়ের পার্থক্য বা ব্যবধান আছে। বলার একটু পরে শুনতে পাচ্ছ। এতটুকু পরে যে কথা শুনলে, এক লক্ষ বছর পরেও তা শুনতে পার। ''পরে'' কথাটা ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে। ১/২/৩ মিনিট পরেই হোক অথবা আরও অনেক পরেই হোক, সেই কথাটা ঐ শব্দটা ভাসয়মান অবস্থায় ভেসে আছে। শুনবার অধিকারী আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত, শব্দটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যের মধ্যে আছে, কথাটা মনে রেখ। সেই কথাটা, শব্দটা যখন মিশে যায়, পরবর্ত্তী অণুপরমাণুতে সেটি আছে। তারা আরও অনেক পরে শুনছে। কিন্তু তারা যখন শুনছে, তাদের মনে

আবার আরও পরে হাজার হাজার মাইল দূরে আছে যারা, তাদের মনে হচ্ছে এখনই শুনছে। আবার লক্ষাধিক বছর আগে যে কথা বলেছেন, আজও কোন ব্যক্তি মনে হয়, সে কথা এখনই শুনছেন।

---

* শব্দগুণকম্ আকাশম্। আকাশের (মহাশূন্যের) গুণই হচ্ছে শব্দ বা ধ্বনি।

হচ্ছে এই কথাটা এখনই শুনছে। আবার আরও পরে হাজার হাজার মাইল দূরে আছে যারা, তাদের মনে হচ্ছে এখনই শুনছে। আবার লক্ষাধিক বছর আগে যে কথা বলেছেন, আজও কোন ব্যক্তির মনে হয়, সে কথা এখনই শুনছেন। কথা ঠিকই বলে যাচ্ছে। কথা শুনা না গেলেও যে কথা বলছে না বা কথা হচ্ছে না, তা নয়।

আবার এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে, এক মাইল দূরের কথাটা যারা এক হাতের দূরের মত শুনছে। এমন জীবও আছে, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের কথা, এক হাতের দূরের মত শুনছে। সাধারণতঃ আমাদের ঘরে চিনি থাকলে বা ফল কাটলে আমরা ঘরের পাশ দিয়ে গেলেও টের পাই না। কিন্তু ৫০০ থেকে ৬০০ মাইল দূরের জীব টের পাচ্ছে না? কিভাবে গন্ধ পেয়ে চলে আসে? গন্ধ এখানেই থাকে না। হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায়। আমরা টের পাচ্ছি না। সেই গন্ধ অনেক দূর চলে যায় বলেই জীব দূর হতে টের পায়। এইভাবে ছড়িয়ে পড়াটাই নিয়ম। শব্দ, গন্ধ এই যে মিলে মিশে যাচ্ছে, এই মিশে যাওয়ার পদ্ধতি, এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। চক্রগুলো কি করছে? এই যে শব্দ তিনি এক লক্ষ মাইল দূর হতে যখন কথা বলছেন, সেই শব্দ, সেই ধ্বনি আকাশে বাতাসে বিলীন লীন হয়ে যাচ্ছে। মহাশূন্যেই তার অস্তিত্ব পূর্ণ সত্তায় বিরাজমান অবস্থায় বিরাজ করছে।

গাছের পাতায় গন্ধ নেই। গাছের ছাল বাক্‌লায় গন্ধ নেই। ফুলের কলিতেও গন্ধ নেই। আবার গোলাপ ফুল যখন ফোটে, চারিদিক সৌরভে আমোদিত হয়ে যায়। কে জানতো আগে এর মধ্যে এত গন্ধ ছিল? আস্তে আস্তে তার গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণু সুরে থাকার মতো এমন পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যে, ইহাতে মন নিবিষ্ট করলে যে glands আছে, সেই gland গুলি ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। সেখানকার কথা, সেই gland গুলোর কথা হচ্ছে, যে জিনিস ফুটে ওঠে

আমাদের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণু সুরে থাকার মতো এমন পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যে, ইহাতে মন নিবিষ্ট করলে যে glands আছে, সেই gland গুলি ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।



মনের কাছে সর্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব, সেই আদি ক্ষমতার আদি শক্তি যে আছে, মনের সেই সেই ক্ষমতার শক্তির দ্বারা জীবলোক আবির্ভূত হয়েছে। এই জগতের সমস্ত অণুতে পরমাণুতে রয়েছে সেই সেই গুণ যাহাতে সহজে অনুভব করা যায়। প্রতি কেন্দ্রে, প্রতি চক্রে সেই সেই গুণ রয়েছে। সেখানে মনকে নিবিষ্ট করে দাও।

তার ক্ষমতা অসীম। সেই কোটি কোটি মাইল দূরে যে গ্রহ-উপগ্রহ আছে, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের বার্তাগুলি ১/২ হাত দূরের কথার মত শুনতে পাচ্ছে। আমাদের দেহের মধ্যে কেন এভাবে চক্রগুলি, কেন্দ্রগুলি রয়েছে? যেই যেই বিষয়বস্তু হতে জীবলোক আবির্ভূত, সেই সেই বস্তুর গুণগুলো আমাদের মধ্যে সজাগ রয়েছে। সেই সেই কেন্দ্রে মনকে কেন্দ্রীভূত করলে gland গুলো আপনি জেগে ওঠে, আপনি ফুটে ওঠে। সেইভাবে জল, বাতাস, খাদ্য হতে অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুগুলো ভেদ করে আমরা যেভাবে এসেছি, যে যে সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি এবং যাচ্ছি, দুটোই একই অবস্থা। এমনভাবে সেই সেই গুণগুলি প্রতি কেন্দ্রে সাজানো রয়েছে যে, মন যদি সুযোগ পায় নিবিষ্টতার, তবে সেই সেই কেন্দ্রে মনোনিবেশ করে সেই সেই আকার নিয়ে সমস্ত সূক্ষ্ম বস্তুর সহিত একাত্ম হতে পারে। তাই মনের কাছে সর্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব, সেই আদি ক্ষমতার আদি শক্তি যে আছে, মনের সেই সেই ক্ষমতার শক্তির দ্বারা জীবলোক আবির্ভূত হয়েছে। এই জগতের সমস্ত অণুতে পরমাণুতে রয়েছে সেই সেই গুণ যাহাতে সহজে অনুভব করা যায়। প্রতি কেন্দ্রে, প্রতি চক্রে সেই সেই গুণ রয়েছে। সেখানে মনকে নিবিষ্ট করে দাও। সেই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করো। সেই অনাহতে আমাদের সমস্ত রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা যখন বইতে থাকে, আমরা কতই না বলি বুকে হাত দিয়ে, 'আর পারি না।' এমনই যন্ত্র এমনই নীতি, ঠিক জায়গায় হাত আপনি এসে পড়ে। বাচ্চা শিশুকে যেমন শিখিয়ে দিতে হয় না, ক্ষুধা পেলে আপনি মুখে হাত দেয়, খাবার তুলে নিয়ে মুখে দেয়, এদিকে ওদিকে দেয় না, আমরাও তেমনই বুকে বা মাথায় হাত দিয়ে মনের অবস্থা প্রকাশ করি। এক এক অবস্থায়, এক এক যাতনার মাঝে এক এক জায়গায় হাত দিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করবার জন্য বলি, ওঃ। আমরা নিজেকে তৃপ্ত করতে চাই। অনাহত

বা বিশুদ্ধের ভিতর যে হাত দেওয়া, কেহ তা শিখিয়ে দেয় নাই। এটা স্বাভাবিকভাবে আপনিই আপন হাত চলে আসে। সেই অনুভূতির সুপ্ত নিনাদের সুর বয়ে চলেছে দেহের প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে। যখন যেমন প্রয়োজন মিলনের জায়গায় সেই অনুভুতির সুর আপনি সেখানে এসে যায়। আপনি কপালে (আজ্ঞাচক্রে) এমনভাবে হাত দিই, আবার মাথায় (সহস্রারে) হাত দিচ্ছি, এইটাই সহজগতি। সেই মৃগ নিজস্ব কস্তুরী গন্ধে আপনি যেমন ছুটতে থাকে, আমরাও ছুটছি অনুভূতির স্পর্শে হাত বুলিয়ে। এই যে বুলিয়ে যাবার বোল, আপনি বোল দিয়ে চলেছে। এই যে স্বাভাবিক গতি, প্রকৃতির নৈসর্গিক ধারা, এই ধারাতেই চলেছে সৃষ্টি অনাদি অনন্তকাল। শিশুকে কেউ ব্যায়াম শিক্ষা দেয় না। শিশু যেমন হস্ত পদ সঞ্চালনে আপনগতিতে ব্যায়াম করে যাচ্ছে, এটাকেই নিয়ম ধরে ধরে বৈঠখারির মত বুকডনের ভিতর দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির পথেই যাচ্ছে।

শিশু যেমন হস্ত পদ সঞ্চালনে আপনগতিতে ব্যায়াম করে যাচ্ছে, এটাকেই নিয়ম ধরে ধরে বৈঠখারির মত বুকডনের ভিতর দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির পথেই যাচ্ছে।

সাধনার জিনিস কি? যেটা আছে, তাকেই ধরে ধরে, তাকেই বাড়াতে হয়। মণিপুরে জপ, অনাহতে মন স্থির করে জপ, এই যে অবস্থাগুলি আপনি কেন্দ্রীভূত হয়ে ফুটবার অবকাশে থাকে, যেমন শিশুর অঙ্গ সঞ্চালনে আপনিই একটু একটু করে সচেতনতার সাড়া ফুটে ওঠে। আমাদের এই দেহবীণাযন্ত্রের ভিতরে ইন্দ্রিয়গুলির যে অসীম ক্ষমতা, তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আমরা ব্যাবহারিক জগতে পেয়ে যাচ্ছি। স্বাদে গন্ধে যে নমুনা বা ইঙ্গিত পাচ্ছি, এই যে দর্শন করতে পারছি, শ্রবণ করতে পারছি, খেতে পারছি অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি, এটা সেই বিরাটেরই নমুনা বা ইঙ্গিত। তারজন্য যে তন্ময়তা, এতটুকুনু ইঙ্গিত বা অনুভূতির ইঙ্গিতে আমরা যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এই উন্মত্ততাও সেই ইঙ্গিত। ইন্দ্রিয়ের চাহিদাতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাস্তবে এতটুকু তৃপ্তির জন্য এত উন্মাদ; সুখ সুখ করে

তেজের সতেজতার উপর নির্ভর করে সব সুরগুলি খেলে যাচ্ছে। তাহাতে সেই শক্তি আমাদের অনাহতে রয়েছে। সেই জায়গায় মনোনিবেশ করলে আমরা অনন্তশক্তির সাড়া পেতে পারি। সেইভাবে আমরা আদিশক্তির সবকিছু সহজভাবে বুঝতে পারি।



ওটাকে ভরপুর করার জন্য এত যে ব্যস্ত হয়েছি; যশ, ছল, বল, কৌশল খাটিয়ে যে পরমশান্তির জন্য ধাইছি, তাহাতেও আমরা এক পুকুরেই সব করছি। এক পুকুরেই থুথু ফেলছি, আবার সেই জল ব্যবহার করছি। তাতেই আবার স্নান করছি, গো-মহিষ সবাইকে স্নান করাচ্ছি, সব এই সীমাবদ্ধের মধ্যেই। কিন্তু পরমশান্তি পেতে হলে অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে মনকে প্রসারিত করতে হবে। ছেলে থাকলেই বাবা থাকবে। একটা জিনিস থাকলে আরেকটা জিনিস থাকবে। এভাবেই চলেছে সৃষ্টির অনন্তধারা। বাহ্যিক কিছু না থাকলে চলতো না। এতটুকু sample থাকলে, তা থেকেই বিরাট ফ্যাক্টরীর সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের দেহযন্ত্রের ভিতরে এই যে চক্রগুলি বহু বহু শিরা উপশিরা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে, ইহাতে নির্ভর করছে জল, বাতাস, বায়ু। তেজের সতেজতার উপর নির্ভর করে সব সুরগুলি খেলে যাচ্ছে। তাহাতে সেই শক্তি আমাদের অনাহতে রয়েছে। সেই জায়গায় মনোনিবেশ করলে আমরা অনন্তশক্তির সাড়া পেতে পারি। সেইভাবে আমরা আদিশক্তির সবকিছু সহজভাবে বুঝতে পারি। জন্ম যখন হয়েছে, অনুভুতি যখন রয়েছে, হবে হতে বাধ্য। মাছ সাগরে রয়েছে, আবার বলছে 'সাগরে যাব'। আমরা বিরাট মহাশক্তির সাগরে আছি বলেই আবার বলছি, 'সাগরে যাব।'

আমরা সেই হুংকারে আছি, তাতে ভরপুর হয়ে আছি। বিরাট সাগরে ভরপুর আছি। আবার 'বিরাট বিরাট' করে চিৎকার করছি। কিন্তু যখন আমরা বলি যে, 'আছি', সেই বিষয়বস্তুর উপর যদি বারবার মনোনিবেশ করা যায়, 'আছে' বস্তুকে জানবার জন্য যদি বারবার খোঁজ করা যায়, সহজভাবে আপনি দ্বার খুলে যায়। গ্রন্থিগুলি এমনভাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে যে, আপনি খুলে যায়। সমস্ত অনাহতের কণিকাগুলি আপনি খুলে যাবে, বিকশিত হয়ে উঠবে। এই হুংকারের অবস্থা আপনি উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জে সমস্ত কণিকাগুলি এমন সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে যে, ঝংকার দিয়ে ওঠে। বাতাস দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অনুভব করতে তো পারছি। বেঁচে যে আছি, তা বুঝা যায়।

আমরা বুঝেও যে বুঝি না, পেয়েও যে পাইনা, এই বিভ্রান্তির অবস্থায়

কেন আছি? এই দোদুল্যমান অবস্থা না থাকলে সহজভাবে পৌঁছানো যেত না। আমরা যে দোদুল্যমান অবস্থায় আছি, এটা হলো অনাহতের অবস্থা। এই দোদুল্যমান অবস্থা আছে বলেই সহজভাবে যাওয়া যায়। অনন্ত পৃথিবীর শূন্যময় অবস্থাতে, বিশ্বের সর্বভূতে সর্বজায়গায়, সেই অনাহতের হুংকার বা ধ্বনিময় অবস্থা রয়েছে। সমস্ত গ্রন্থি, সমস্ত গ্রন্থ এখানে বাঁধা, আমাদের জীবনের সবকিছু বাঁধা। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি বেদ। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ, উপগ্রহ হয়ে রয়েছি। এই যে আমাদের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত রূপান্তরিত অবস্থায় সবকিছু নিয়ম যে পালন করে আসছি, এই পালন বৃত্তিটা স্বাভাবিক রীতিনীতিকে অবলম্বন করেই আসছে। এই যে মৃত্যু, তার (মৃত্যুর) করাল গ্রাসে সকলকেই যেতে হচ্ছে। যতই হুড়ুম দুড়ুম করুক না কেন, কেউতো মৃত্যুকে আটকাতে পারছে না। যে যতই আস্ফালন করুক, আবার লীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর পারছে না। ততটুকুর মাঝে থেকে যে মরণকে সীমাবদ্ধের মধ্যে বরণ করে রাখা, সেই স্মরণেই তো চলছে সবাই। এই ইন্দ্রিয়গুলো দেহের মাঝে মাকুর মত ঠক ঠক করে চলছে। এই যে আমরা সংসারে সবকিছু তৈরী করছি, নিয়মগুলো ঠিক আছে, মাকুর মতন। এই নিয়মের ভিতরেই আমরা মৃত্যুকে বরণ করছি। বিশ্বপ্রকৃতির জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। যেটাকে মৃত্যু বলছি, সেটা মৃত্যু নয়। আমরা বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে ডুবিয়া দেখি, জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। বাহ্যদৃষ্টিতে সাময়িক যে মৃত্যু দেখছি, সেটাই প্রকৃত নয়। তাই বলা হয়, জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। যেটাকে 'মৃত্যু' বলে বলি, সেটা রূপান্তর বা পরিবর্তন মাত্র। আমাদের সেই শিশু অবস্থা, সেই যৌবন অবস্থা কোথায় গেল? কেহ মরেনি, সব এগিয়ে চলছে। জাগ্রত বস্তুগুলি চিরজাগরিত হয়ে পরিবর্তনের মাঝে আজও এগিয়ে যাচ্ছে। এটাকেই জন্ম মৃত্যু নামে অভিহিত করছি।

অনন্ত পৃথিবীর শূন্যময় অবস্থাতে, বিশ্বের সর্বভূতে সর্বজায়গায়, সেই অনাহতের হুংকার বা ধ্বনিময় অবস্থা রয়েছে। সমস্ত গ্রন্থি, সমস্ত গ্রন্থ এখানে বাঁধা, আমাদের জীবনের সবকিছু বাঁধা। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি বেদ।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাময়িক যে মৃত্যু দেখছি, সেটাই প্রকৃত নয়। তাই বলা হয়, জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। যেটাকে 'মৃত্যু' বলে বলি, সেটা রূপান্তর বা পরিবর্তন মাত্র।



সেই জল নিদাঘের রাগের জল শুকিয়ে টেনে নিলে যেমন বুঝা যায় না, দেখা যায় না। কিন্তু বৃষ্টি হয়ে যখন পড়ে, তখন বুঝি কত হাজার হাজার টন জল টেনে নিয়ে যায় উপরে। আমরা যাওয়ার পদ্ধতিতে সদাই পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছি। যে নিয়মাবলীর মাধ্যমে এই আসা যাওয়া চলছে, তা জানিয়ে দিচ্ছে, ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই যে যাওয়া আসার পদ্ধতিতে জন্ম মৃত্যু চলছে, এটা প্রকৃতির নিয়মে নিজেকে নিজে জানবার জন্য মহাশূন্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার যে বৃত্তি, মহাশূন্যের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ার যে গতি, এই গতি কোথা থেকে এল? এই যে অনাহতের সাড়া, এটা আর কোনমতে পূরণ হয় না। সেই বিরাট মহার্ণবরূপ গভীর যে গর্ত, এই অণুপরমাণুগুলিকে সে চায় পরিপূর্ণ করতে। এই গহ্বর পরিপূর্ণ। এটা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, প্রতি রক্তকণিকায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমরা সর্ব অবস্থায়, বিভিন্ন অবস্থায় একেক ভাবে আছি। কেহ ইঙ্গিত বুঝে, কেহ ভাবে বুঝে, কেহ কেহ তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন। আবার কেহ বা দেরীতে বুঝে, কেহ তাড়াতাড়ি বুঝে। যন্ত্রের বিকাশের অবস্থায় নানা অবস্থা। কেহ সুযোগ পেয়ে যায় ফুটে উঠবার। ফুটে উঠলে সেই অনন্ত গতির কথা আবার তার কাছেই সহজ স্বাভাবিক হয়ে যায়। যতদূরে যাবে, মাঝে মাঝেই মনে হয়, সমস্যা, অশান্তি, রোগের পর রোগ, শোক, দুঃখের কথা। এইভাবে যেতে যেতে এমন জায়গায় যায়, যখন ঢেউ আপন বাড়ি খেয়ে আপনি ফিরে আসে। মণিপুরে ধাক্কা খায়, মণিপুর মূলাধারে ধাক্কা খায়। তখন এক মহানন্দের ঢেউ বিরাট আকারে ফুটতে থাকে। এই যে ভাবগুলো আপনি খেলে যাচ্ছে আমাদের ভিতর স্বাভাবিকভাবে। একে কল্পনা করে আনতে হবে না। এটা এমনি আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে।

বিষয়বস্তু জটিল। এগুলি আস্তে আস্তে একটু একটু করে যদি বলা যায়, সবাই বুঝতে পারে, সবার বুঝার পক্ষে ভালো হয়। যা হোক, ঘরোয়া করে বলছি। তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

আগুন আছে, লোহার পাত্র আছে; জল আছে, তৈল আছে। প্রথমে লোহার পাত্র গরম হয়, পরে তৈল, জল গরম হয়। আগুনের রং জলে হয় না। জল আর আগুনের রং এক নয়। তবে আগুন বুঝিয়ে দেয় যে

সে অন্য আকারে আছে। আগুনে হাত দিলে সে ক্ষমা করবে, তা নয়। জল আর আগুন, এক নয়। এইভাবে জলের পাত্র এখানে আছে। আগুন অনেক দূরে আছে, জ্বলছে। আগুন অনেক দূরে। কিন্তু সংযুক্তে আছে। তাই জল টগবগ করছে। কোথায় বিশ্ব প্রকৃতি, কোথায় আমরা? উনুনের কাজটা কিভাবে করছি? এই যে আলো জ্বলে ওঠে, দুটো তারের সংযোগে হয়। এটা ধরলেও ঠান্ডা, ওটা ধরলেও ঠান্ডা। আবার বিদ্যুতের তার দুটো মিশলেই কি সুন্দর জ্বলে ওঠে? ধ্যাস্ করে মুহূর্ত্তে জ্বলে ওঠে। এরকম আমাদের ভিতরে অজস্র বিদ্যুতের তার আছে। প্রকৃতির জিনিস আমরা চোখে যে দেখছি, এভাবে চোখ দিয়ে দেখে দেখে দর্শনের ভিতর দিয়ে একটা তাপমাত্রা, একটা কিছু টেনে নিচ্ছি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শের ভিতর দিয়ে আমরা কিছু কিছু তাপমাত্রা টেনে নিচ্ছি এবং সেই তাপেই দেহের কেন্দ্রগুলি জেগে উঠছে। পাহাড়, পর্বত দেখছি; এর ভিতর দিয়ে তাপ টানছি। এই যে দেখার ভিতর দিয়ে, শ্রবণের ভিতর দিয়ে তাপ টানছি, এটা বুঝা যায় না। ভাত, ডাল খাচ্ছি। কে বলবে, এগুলো শিরা উপশিরায় গিয়ে লাল হয়ে যায়। কতকগুলি কেন্দ্র, কতকগুলি স্থান যে বিশেষভাবে জাগরিত থাকে, কেন? এই যে চোখ, মুখ এত যে সব রয়েছে, কেবল যে ঝগড়া, বিবাদ করবার জন্য তা নয়। বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে, স্থানগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেহযন্ত্রের মাঝে সবকিছু সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। সাপ যেমন বসে থাকে, দূর থেকে আহার টেনে নেয়, আমরাও এটি করছি। আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টির ভিতর দিয়ে, শ্রবণের ভিতর দিয়ে, ভাবপ্রবণতার ভিতর দিয়ে নানা বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে চলেছি। এই দেহযন্ত্রটা শুধু সংগ্রহ করবার জন্য। হাতির শুঁড় জল টানে। সেই জল দিয়ে ফুঁৎ ফুঁৎ করে রাস্তা পরিষ্কার করছে। আবার একটা হাতির পায়ের তলায় সামান্য একটা কুলবীচি পড়লে, হাতি মারা যেতে পারে। আমাদের চক্ষুর একটা সুর আছে, কানের একটা সুর আছে, তা দিয়ে আমরা টেনে নিচ্ছি। কিভাবে

এই যে চোখ, মুখ এত যে সব রয়েছে, কেবল যে ঝগড়া, বিবাদ করবার জন্য তা নয়। বিশেষ কেন্দ্রগুলিকে, স্থানগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেহযন্ত্রের মাঝে সবকিছু সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতি কত বড় উন্মাদ, প্রকৃতির নিজস্ব সত্তায় বলছে, 'আমি আমাকে বুঝতে চাই, জানতে চাই।' নিজেকে জানবার জন্যই প্রকৃতির যত প্রচেষ্টা।



টেনে নিচ্ছি? সূর্য যে জল টেনে নেয়, দেখা যায় না। আমরা সংগ্রহ করবার জন্য যে সুর এগিয়ে দিয়েছি, সেটি আমাদের দেহ ও নানা ইন্দ্রিয়। আমাদের দেখে যাওয়াটাই টান, যে টানে সংগ্রহ করা যায়। শুধু খাতা লেখাতেই আমরা শেষ করছি না। যত কাজই আমরা করি না কেন, সেই সুর হাতির শুঁড়ের মত টেনে নিচ্ছে। এই যে অবস্থা, প্রকৃতি কত বড় উন্মাদ, প্রকৃতির নিজস্ব সত্তায় বলছে, 'আমি আমাকে বুঝতে চাই, জানতে চাই।' নিজেকে জানবার জন্যই প্রকৃতির যত প্রচেষ্টা। একটা পাখীও বলে, 'নিজেকে জানতে চাই। ' আমরাও সমস্ত জীবনময় নিজেকে জানবার জন্য* কাজ করে চলেছি। এইভাবে চলতে চলতে কখন সবকিছু 'নিজেকে' হয়ে গেছে। অনন্ত নিজেকে একত্র করে একটা নিজেকে হয়ে গেছে।

সূক্ষ্ম বস্তু বুঝুক বা না বুঝুক অনেকের জানবার দেখবার আগ্রহ আছে, বুঝবার আগ্রহ আছে, 'চলো তো দেখে আসি, কি সুন্দর।' নিজেকে দেখাবার জন্যও বহুরকম পথ পদ্ধতি আছে। নিজেকে দেখাবার জন্য যার বোঁচকায় যতকিছু আছে, সব উজাড় করে দিচ্ছে। নিজেকে বুঝাবার জন্য, নিজেকে তৃপ্ত করবার জন্য, নিজেকে খুশী করবার জন্য প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ করছে। নিজের জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে নিজেকে তৃপ্ত করছে। এই যে নিজেকে জানতে চায়, সেই আদিশক্তির সুরের সুরটার বহুমুখী প্রকাশ এটা। এই একত্বের সুরটাই বহুরূপে প্রকাশ। আমরা যেমন টর্চ মেরে মেরে দেখে নিই, চোরেও টর্চ মেরে দেখে নেয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে টর্চ। চোখ, কান, জিহ্বা টর্চ মেরে সুরগুলিকে সুরে আনবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ না সুরে মেলে হাবুডুবু খেতে খেতে চলতে থাকে।

নিজেকে বুঝবার জন্য, নিজেকে তৃপ্ত করবার জন্য, নিজেকে খুশী করবার জন্য প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ করছে।

তবলচি যন্ত্র যে বাজাচ্ছে, গানের সঙ্গে যতক্ষণ না সোমে মেলে বাজাতেই থাকে। সোমে মিললেই 'হুঁ' করে বসে পড়ে। সবাই চায় মেলাতে, সোমেতে লয়েতে। আঠারোর জায়গায় ১৬ হওয়াতে মেজাজ খারাপ। আমারই

---

* আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জান।

সবটারই সোম, লয়, ফাঁক আছে। নাকে সর্দি খেতে পারে না নিমন্ত্রণে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। এর চেয়ে সাবু, বার্লি ঢের ভালো। পোলাও মাংস সুরে মিলছে না।

এক শিষ্য না মেলাতে পারায় ছেলের মাথায় এক থাপ্পর দিয়ে বসেছে। এতটুকুনু মিলতে চায়। যন্ত্রে, তন্ত্রে, মন্ত্রে সর্বরকমে মিলতে চায়। দেখি, দেখি, মিলে গেছে কি না। সুর না মিললে, মিলাতে না পারলে, 'না মশাই, মিলছে না।' আবার 'হাঁ হাঁ'। এটাও একটা মিলতি। সবটারই সোম, লয়, ফাঁক আছে। নাকে সর্দি খেতে পারে না নিমন্ত্রণে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। এর চেয়ে সাবু, বার্লি ঢের ভালো। পোলাও মাংস সুরে মিলছে না। ঘ্রাণের সঙ্গে আর স্বাদের সঙ্গে মিলছে না। বড়ার কড়কড়ানি না শুনলে ভালো লাগছে না। শুধু বাজনাই সুর নয়। ভাতটা নরম হয়েছে। থালা ফেলে দিল। আর যার দাঁত নেই, নরম ভাত জিহ্বায় দিলেই যুৎ লাগছে, সুর মিলছে। এক একজনের চেহারা দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সুরের মিল নাই। ঝাল, মশলা ছাড়া রান্না ভালো লাগছে না। আবার যার পেট তত ভালো নয়, তার সুরে মিলে গেছে। এমনি জিনিস মিলাতে মিলাতে চলেছি। স্ত্রীর কথা স্বামী শুনতে পারে না। ছেলের কথা, ছেলের নাম শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি তো sorrow-bank নিয়ে বসে আছি। যার যেটা দুঃখ, সবটা আমায় দিয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের নালিশ। সব দুঃখের ঘর, সুখের ঘর নাই। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে। বলতেও পারে না কাহাকে লজ্জায়। এর ঔষধ কোথায়? কিভাবে মিলনের সুর খুঁজে পাবে? বাড়ীতে যাও, স্ত্রী এমনি করে বসে আছে। স্বামী ওমনি করে বসে আছে। স্ত্রী চা এনে দিয়েছে। খেলো না, ও ঘরে গিয়ে বসে আছে। মা এলো, ছেলেরা দেখলো, বাবা রাগ করেছে। বই পড়ছে, বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায়ই আধঘন্টা রয়ে গেছে। সন্দেহ মিটবার জন্য কতরকম কথা। সকল অবস্থায় দেখাতে চায়, পারে না। অবস্থাটা কি? কেউ কারও অবস্থায় মিলতে পারছে না। একটা না একটা সন্দেহ, কারও উপর সন্দেহটা মিটছে না।

এক বিরাট অবস্থাপন্ন ঘরের বৌ। হঠাৎ আমার দরজার গোড়ায় এসে বলে suicide করবে। কেন? না যে বাড়ীতে সন্দেহ করে, সেই বাড়ীর scent-এর গন্ধ এর গায়ে পেয়েছে। পরে স্বামী এলো। রাত তিনটে অবধি বোঝালাম। আমায় কত যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। একদিক দিয়ে সব খুলতে আরম্ভ করেছে,



সংসারে মিলতি যখন হয়, আনন্দ নিকেতন গড়ে ওঠে। অনাহত হচ্ছে সেই জায়গা। সর্ব অবস্থায় সে সুর মিলাতে চায়।

আর আমি পরাতে আরম্ভ করেছি। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আমি কতজনের সংসার যে জোড়া লাগাই। কত সংসার যে ভেঙ্গে যাচ্ছে, কত সংসার যে জোড়া লাগাচ্ছি। কিছু বন্ধুবান্ধব থাকে। তারা 'তাইতো, যা হবার হয়ে গেছে', বলেই খালাস। এই অবস্থাগুলি কেন? সুরের সঙ্গে সুর মিলাতে সবাই চায়। ছেলে, মেয়ে বাবা সুন্দর সংসার। বৃদ্ধ পিতা নালিশ করছে, রামের মত ছেলে আমার, ভাত দেয় না স্ত্রীর কথায়। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল, সাধারণ একটা কারণের জন্য এই অবস্থা। সংসারে মিলতি যখন হয়, আনন্দ নিকেতন গড়ে ওঠে। অনাহত হচ্ছে সেই জায়গা। সর্ব অবস্থায় সে সুর মিলাতে চায়। সাগর উথাল-পাথাল করছে, তার একটা rythm (ছন্দ) আছে। ঘুমের সময় ঢুলছে, এটাও একটা রিদম্। আবার ভাবছে, 'আর করবো না', এটাও রিদম্। সর্ব অবস্থায় একটা রিদম্ আমাদের মধ্যে খেলা করতে থাকে। নিভৃতে যখন এক ব্যক্তি থাকে, সে এলিয়ে পড়ে। শান্ত অবস্থায় ঢেউয়ের মাঝে দোলায়মান করে নেয়। সবসময় শান্ত করে দেবার জন্যই নিভৃত অবস্থা। মানুষ যে এভাবে (গালে হাত দিয়ে) চিন্তায় বসে, সেটা একটা ভঙ্গিমা। নানারকম pose আছে। এই যে ভাবপ্রবণতা আছে মানুষের অন্তরে, তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়ে যায়। কাগজ কুড়ায় যারা, কাগজ দেখলে ঘুম থেকে ওঠে। আবার নোংরা কাগজ কুড়িয়ে ছালা (বস্তা) ভরে নিয়ে যায়। এটাই যে সিদ্ধ টিদ্ধ করে ক্লেদ বার করে, তা হতেই খেলনা বানিয়ে নেয়।

শাস্ত্রের যে তত্ত্ব, সেটা ব্যাখ্যায় এসে পড়ছে। আর ডুবুরীর যে তত্ত্ব, সে ভরপুর করে দেয়।

অনাহতে সুরগুলি কি করছে? এই যে সুরগুলি টোকাচ্ছে (কুড়াচ্ছে), ছল বল কৌশল নোংরামি ইত্যাদি সুরগুলো সব টুকিয়ে টুকিয়ে (কুড়িয়ে কুড়িয়ে) খোলতাতে (থলিতে) ভরছে। গম ভাঙ্গার বা তৈল বের করার যে যন্ত্র, পিষতে পিষতে যখন তৈল বের হয়, এক জায়গায়ই পড়ছে। অনাহত যন্ত্রে সব চূর্ণাবিচূর্ণ হয়ে সুন্দর হয়ে বের হল। পেষাইবার যন্ত্রটি (অনাহত), এই যে চন্দন দিয়ে ফোঁটা দেয় বক্ষে, সেই সেই কেন্দ্রে (চক্রে) ফোঁটা দেয়, কেউ কেউ আবার মূলাধারেও দিল। সুতরাং সবটাকেই এটার (অনাহত চক্রের) দরকার আছে। সুরগুলি নিয়ে যন্ত্র (অনাহত)

কি করছে? ভরপুর করছে। শুধু যে এটাই টানছে, তা নয়। সব কটাই ভরছে। কারণ হচ্ছে কি? শাস্ত্রের যে তত্ত্ব, সেটা ব্যাখ্যায় এসে পড়ছে। আর ডুবুরীর যে তত্ত্ব, সে ভরপুর করে দেয়।

একদিন যে বলেছিলাম, আমি খনি থেকে, তত্ত্বের ভাণ্ডার থেকে তুলে এনে তোমাদের দিচ্ছি। Ornaments করতে আমার অসুবিধা ঐ যে বৌবাজারে* সাজিয়ে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, ওটাতে অসুবিধা। অনন্তখনির সোনা এখানে। ঐ নেশায় (তত্ত্বের নেশায়) যে ডুবেছে, তার আর অন্য কিছুতে ভাল লাগবে না। তাই বলছি, সিদ্ধির সিদ্ধিতে শিব সূর্যকে যে কল্কিতে ভরেছিলেন, বৃহৎ হুঁকাতে দিয়ে দিলেন টান। তাহাতে ছিল যে নল, তাহাতে ছিল সাগর। তাহাতে যে টান দিলেন শিব, একটানে গুরু গুরু ধ্বনি করে উঠলো, আবার ইহা হ'ল হর হর। সেই সুরের সুরেতে ছিল সূর্যের তেজ। সেই গুরু গুরু ধ্বনি, সেই টানের টানে পূরক ছিল, রেচক ছিল, কুম্ভক ছিল; অনাহত, মণিপুর ছিল। সেই নেশা আজ কল্কিতে গেছে, বোতলে গেছে। কারণ সেই কৃষ্ণও নেই, সেই নিমাইও নেই। আজ সেটা বিড়িওয়ালার হাতে গেছে, মদেও গেছে।

সেই নেশা আজ কল্কিতে গেছে, বোতলে গেছে। কারণ সেই কৃষ্ণও নেই, সেই নিমাইও নেই। আজ সেটা বিড়িওয়ালার হাতে গেছে, মদেও গেছে।

ছেলেবেলা থেকে নিজে ডুবে আছি এই তত্ত্বে। ছেলেবেলা থেকে ডুবুরী হয়ে ডুবে ছিলাম বলেই আমিই বেদ। কারণ নিজের সাথে বিশ্বসত্তার সাথে এক হয়ে আছি বলেই আমি আজ হতে একমাস পর্যন্ত অনর্গল বিশ্বতত্ত্বের কথা একহাত তুলে বলে যেতে পারি। এত তত্ত্ব রয়ে গেছে। সাগর নিজের ঢেউয়ে নিজে নাচে। আমি নিজের কথা নিজে বলি দৃষ্টান্ত দিয়ে। অনেকে বইয়ের কথা বারবার বলে, যে চলে গেছে বহুবছর আগে। তাই জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের কথা নিজে বলি, বুঝাবার জন্য। যে নাচ শেখায়, সে নিজে নাচে। আমিও আমার কথা বারবার বলি তোমাদের আত্মজ্ঞ হবার জন্য; নিজেকে প্রচার করবার জন্য নয়, মনে রেখো। সূর্যকে চাপাবার জন্য ছাতি। ছাতি (বক্ষ) গরম করে ছাতা গরম করবে। বুঝতে হবে, তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করবে।

---

* বৌবাজার - কলকাতার বিখ্যাত Jewellery Market.

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# গীতা হচ্ছে এই বিরাট পরিদৃশ্যমান জগৎ

**গোলবাজার অশোকনগর, হাবড়া**
**১৪-০১-১৯৬১**

বেদমন্ত্র .....

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই অনন্ত জগৎ গীতাস্বরূপ। এই গীতা হতে আমরা কি অমৃত পান করি, তা আমাদের জানতে হবে। গীতা হচ্ছে এই বিরাট পরিদৃশ্যমান জগৎ। সেই আদি বেদশাস্ত্র বিকৃত হতে হতে দেশের অবস্থা কি হয়েছে, তা জানা দরকার। সেই আদি পালি বা বেদ না বুঝলেও শব্দেই কাজ হয়। এই মহাগীতা, এই জগৎ গীতার অন্তর্নিহিত অর্থ ভাল করে বুঝতে হবে। ধর্ম কোথায়? এই বাস্তবতার ভিতর ধর্ম লুকানো আছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর ভিতর ধর্ম লুকানো রয়েছে। ধর্ম অবাস্তব নয়, ধর্ম কল্পনা নয়। বাস্তব এবং ধর্ম একই সাড়ায় রয়েছে। বাস্তব সত্যের বিকৃত অর্থ করে দেশের আজ এই অবস্থা হয়েছে। এই শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ আজ গল্পে পরিণত হয়েছে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই অনন্ত জগৎ গীতাস্বরূপ। এই গীতা হতে আমরা কি অমৃত পান করি, তা আমাদের জানতে হবে। গীতা হচ্ছে এই বিরাট পরিদৃশ্যমান জগৎ।

জীবগ্রন্থে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একেকজন বেদ, উপনিষদ। এই জীবগ্রন্থেই ভগবদ্‌দর্শন, অন্যত্র নয়। এই জীবগ্রন্থকে যদি বারবার খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, তবে সেই সাড়াকে সুরে আনতে পারলেই কাজ হয়। যে ভগবান কল্পনায় আছে, আমরা তাকে ডাকবো না। যে ভগবানকে

যে ভগবানকে আমরা অনুভুতির মাঝে পাবো, তাকেই ডাকবো। ভগবানের ভগবৎ সত্তা শুধু স্বর্গলোকে বা মাহাত্ম্যে নয়। ভগবানের ভগবৎ সত্তা সমস্ত ধুলিকণাতে, বায়ুতে, অণুপরমাণুতে ব্যাপ্তমান হয়ে রয়েছে।

আমরা অনুভুতির মাঝে পাবো, তাকেই ডাকবো। ভগবানের ভগবৎ সত্তা শুধু স্বর্গলোকে বা মাহাত্ম্যে নয়। ভগবানের ভগবৎ সত্তা সমস্ত ধুলিকণাতে, বায়ুতে, অণুপরমাণুতে ব্যাপ্তমান হয়ে রয়েছে। আমরা তাঁকে মননের যন্ত্রের সাহায্যে মন্থনের দ্বারা মাখনের ন্যায় বের করবো। সূর্য চির উদীয়মান। পৃথিবীর ঘূর্ণিপাকের পাকে আমরা সূর্যের উঠানামা (উদয় অস্ত) দেখছি। তেমনি বিভ্রান্তির ফলে আমরা ভগবানের উঠানামা নিয়ে ভাবছি। আমরা জ্ঞান সূর্যকে বৈদগ্ধের দ্বারা দগ্ধ করে অগ্রসর হবো।

আমরা কোন্ যন্ত্রে সাধনা করবো? সেই যন্ত্রটি হচ্ছে দেহবীণাযন্ত্র। আমরা যদি চর্চা করি, সমস্ত দেহের অণুপরমাণুতে বেজে উঠবে সেই সুর। এই হচ্ছে গীতা। এই হচ্ছে উপনিষদ। প্রত্যেকেই এক একটা গীতা, উপনিষদ।

এই মৃন্ময় পৃথিবী, এই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের সমন্বয়ে যে অনন্ত জগৎ, তাতেই ভগবান রয়েছে। যেমন সা রে গা মা সাধনা করলে সুরকে আয়ত্তে আনা যায়, তেমনি দেহের ভিতরে মূলাধার হতে বিশুদ্ধে, আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে সুরের সাধনা করলে সেই অনন্ত সুরকে সুরে আনা যায়। সুর রয়েছে ব্যাপ্তমান এই মহাকাশে। এই দেহবীণাযন্ত্রকে যদি তানপুরার সাধনায় সাধি, সেখানে অণিমা, লঘিমা, অন্তর্যামিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সবই ব্যাপ্তমান রয়েছে। এই চক্রের সমন্বয়ের সুর যদি আমরা আয়ত্তে আনতে পারি, তবে আমাদের সুর সেই সুরে ধরা পড়বে। ভগবানের ভগবৎ সত্তার সুর আপনি ধ্বনিত হবে। ভগবান আছেন কি নেই, জানি না। বাচ্চা শিশু মধুর স্বাদ জানলো ভূমিষ্ঠ হবার পর। কোথায় সুর রয়েছে, আপনিই তার স্ফূরণ হবে। কোন্ নিয়মাবলীর দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, জানার দরকার নেই। আমাদের সুরে সব ধরা পড়বে। সেই রূপের সাধনায় কোন্ উদারা মুদারা তারার সুর বাঁধা রয়েছে সবই জানা যাবে। জগতের সকলেরই এই সাধনায় অধিকার আছে। আমাদের সাধনাতে ধরা দেবে অণিমার সুর, লঘিমার সুর। ঘাস দেখলে কে বলবে দুধ? আবার ঘাস হতেই দুধ আসে। আমরা কোন্ যন্ত্রে সাধনা করবো? সেই যন্ত্রটি হচ্ছে দেহবীণাযন্ত্র। আমরা যদি চর্চা করি, সমস্ত



দেহের অণুপরমাণুতে বেজে উঠবে সেই সুর। এই হচ্ছে গীতা। এই হচ্ছে উপনিষদ। প্রত্যেকেই এক একটা গীতা, উপনিষদ। আমরা এই জগতে সকলে একই স্কুলের ছাত্র।

আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের মিলনেই শিবশক্তির মিলন। সেখানে প্রকৃতি পুরুষের (শিবশক্তির) সমন্বয়ে Mountain হতে Fountain এর (ঝর্নার) ন্যায় বীর্যপাত হয়ে যাচ্ছে, যেন অনন্ত শূন্যকে পূরণ করার জন্য সহস্র সূর্যের কিরণ ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক, ভুবলোক সমস্ত লোক আলোকে আলোকিত। পৃথিবী সূর্য হতে সৃষ্ট; আবার সূর্য তেজ হতে। আমরা তেজের সাধনা করবো। ওস্তাদ যখন একটি খেয়াল বা ঠুংরী গায়, তার কোন অর্থ থাকে না। আস্তে আস্তে সুরে মিলে যায়। ঘন্টা দুই পরে সোম পড়ে। সেই শব্দই হচ্ছে প্রণব ধ্বনি, তার সুর। সেই ধ্বনিই হচ্ছে প্রণব; তার যে সুর, সেই সুরই হচ্ছে হুঙ্কার। সেই হুঙ্কারই প্রণব। শিশুকে ক্রন্দন কে শিখিয়েছিল? ভূমিষ্ঠ হবার পরে শিশুর যে ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি, তার ভিতরে প্রণবের কথা আছে। এর ভিতরে নিনাদের সুর আছে। মা যখন বাচ্চা প্রসব করেন, শুধু 'উঃ উঃ' তার ধ্বনি। উঃ উঃ সহজাত বৃত্তির সহজাত শব্দ। এটাই মূল নিনাদ। কোন হাট বা বাজারের ধ্বনি, দূর থেকে শোনা যায় শুধু গুম্ গুম্ ধ্বনি। সেই ধ্বনিকে সেই হুঙ্কারের মন্ত্রকে আশ্রয় করে আহারে বিহারে সদাসর্বদা যদি দেহবীণাযন্ত্রকে বাজিয়ে তুলি, তবে সেই মন্ত্রের আপনি স্ফূরণ হবে। অনন্ত বিশ্বের ধ্বনির সঙ্গে সেই মন্ত্রের ধ্বনি মিলিত হয়ে এক মহা নিনাদের সুর ফুটে উঠবে। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের মিলনেই শিবশক্তির মিলন। সেখানে প্রকৃতি পুরুষের (শিবশক্তির) সমন্বয়ে Mountain হতে Fountain এর (ঝর্নার) ন্যায় বীর্যপাত হয়ে যাচ্ছে, যেন অনন্ত শূন্যকে পূরণ করার জন্য সহস্র সূর্যের কিরণ ধারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সেই সুরের সাধনাই আমাদের সাধনা, যা আয়ত্ত করলে সব জানা যায়। এই মন্ত্র অর্থাৎ প্রণবের ধ্বনি বাজালে দেহবীণাযন্ত্রের প্রতিটি অংশে সেই ধ্বনি বেজে উঠবে।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

# দেহবীণাযন্ত্রই সর্বশক্তির আধার

**পাম এ্যাভিনিউ**
**১৪-০২-১৯৬৫**

অনন্ত মহাশূন্যের বিরাট শক্তির সকল শক্তি যে সর্বদেহে আছে, এটা প্রকৃতির দান, প্রকৃতির নিয়ম। আদি সৃষ্টির সকল কিছুর সমষ্টিগত ভাব এই জীবদেহে আছে। যে সমস্ত বিভূতিগুলো আছে, সেটা একজনের থাকবে, আর একজনের থাকবে না, তাই হয় না। বিভূতির বিষয় বস্তুগুলো সকল জাতি ও জীবের মধ্যে বিরাজমান। এটা লাভ করতে হলে, আলাদাভাবে যে যন্ত্র তৈরী করতে হবে, তা নয়। যন্ত্র তৈরীই আছে, সেটাকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সার দেওয়া দরকার, তাই করতে হবে। শাস্ত্রে বা নিয়মের বিধিতে যে আছে, সবকিছু অদৃষ্ট, কপাল বা কর্মফলের উপর নির্ভর করছে, এটা কথার কথা। জন্ম জন্মান্তরের অদৃষ্ট বা ভাগ্যফলের উপর নির্ভর করেই যে জীব চলছে, এইরকম একটা কথা বা প্রথা এই দেশে প্রচলিত আছে।

একই সময়ে জন্ম, একজন বিরাট ধনী, আর একজন ভিখারী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। এই বৈষম্যকে আমরা ঐকথা দিয়ে বিচার করি ভাগ্যফল, অদৃষ্ট (যেটা দৃষ্টির বাইরে থাকে)। হতে পারে এটা আশ্বাস বাণী, ভগবান যা করেন। কিন্তু এখানেই এর শেষ কথা নয়। একজন ধনী, একজন ভিক্ষুক। একজন মূর্খ, একজন পণ্ডিত। গুণগুলো শুধু এমনি বিচার হয় না। একজন ভাল গান গাইতে পারে, একজন ভাল পকেট কাটতে পারে।

একই সময়ে জন্ম, একজন বিরাট ধনী, আর একজন ভিখারী, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। এই বৈষম্যকে আমরা ঐকথা দিয়ে বিচার করি ভাগ্যফল, অদৃষ্ট (যেটা দৃষ্টির বাইরে থাকে)। হতে পারে এটা আশ্বাস বাণী, ভগবান যা করেন। কিন্তু এখানেই এর শেষ কথা নয়।



ডিগ্রিলাভ করলে বা লেখাপড়া শিখলেই আমরা পণ্ডিত বলি। কিন্তু কেউ হয়তো ভাল গাছে উঠতে পারে, কেউ ভাল পেনসিল কাটতে পারে। প্রত্যেকটা জিনিসেরই দাম আছে। একজন ভাল রান্না করে। তাকে তো বলে না, আপনি বড় পণ্ডিত। ঝাড়ু যে ভালভাবে দিচ্ছে, কেউ তো একজন ধাঙ্গড়কে বলে না আপনি পণ্ডিত। এর ভিতরও একটা শিক্ষাগত দিক আছে, যার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হয়, শিখতে হয়, জানতে হয়। আমাদের দেশে এসব বিষয়ে কেউ দাম দেয় না। একজন ভাল কলম চালায়, একজন ভালো ঝাঁটা দেয়। একজন ভাল খেলা করছে, একজন ভাল কবিতা লিখছে। একই সময়ে জন্ম। একজন কবি হলো, আর একজন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। দেখা গেল, সে ভাল রং করতে পারে।

প্রত্যেকের ভিতরে একটা না একটা ক্ষমতা থাকে। সেটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই চেষ্টা করতে হয়। একটা মুহূর্ত্তের যদি বেশী কম হয়, একটু ঊনিশ, কুড়ি হয়, তাহলেই বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। একজন ভাল রং করতে পারে, সুযোগ পায় না। তার গুণটা নষ্ট হয়ে গেল। সে যদি সুযোগ পেত, সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারতো।

একটা সাপ, তার কত ক্ষমতা, সাপ ত্রাটক যোগ করে। এই যোগ শাস্ত্রটাই সাপ, ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি হয়ে গেল। সাপ হতেই এইসব যোগ, ধ্যান। একজন সাপকে আঘাত দিয়েছে। ঐ সাপটা ১৮/২০ মাইল দুরে যেয়ে তাকে আক্রমণ করতে গেছে। এত আক্রোশ, কত দূরে সাঁতরিয়ে গেছে। মারতে গেছে, পারেনি। আমারই এক শিষ্য। নাম তার জগদীশ। টেটা দিয়ে সাপটাকে মেরেছিল। ঐ সাপ ১৮/২০ মাইল দূর থেকে রাত্রে জগদীশের বাড়ীতে এসেছে। দরজায় খট্ খট্ আওয়াজে উঠে দেখে সেই সাপ। এত মাইল দূর থেকে চিনে চিনে সে কি করে এল? এই শক্তিটা সবারই আছে কমবেশী। আমরা শুঁকে বলতে পারি কার গামছা? বাবার গামছা? না, মায়ের গামছা? লালবাজারে যে কুকুর আছে, দু'মাইল, আড়াই মাইল শুঁকতে শুঁকতে গিয়ে

একটা সাপ, তার কত ক্ষমতা, সাপ ত্রাটক যোগ করে। এই যোগ শাস্ত্রটাই সাপ, ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি হয়ে গেল। সাপ হতেই এইসব যোগ, ধ্যান।

খুনী বের করছে। সে তো কম বড় মহাপুরুষ নয়? সবাই কি ওর কাছে জোড়হাত করে থাকবে? এরকম অনেক জীবের অনেক শক্তি আছে।

আগেই বলেছি, সাপ ত্রাটক যোগ করে। এখানে অনেক মহাপুরুষ ত্রাটক যোগ করতে লাগলেন। ভগবানের ভগবত্তা, তাঁর বিরাট সত্তা প্রতিটি জীবের মাঝেই পুঞ্জীভূত আছে। সমস্ত জীবের সমস্তগুণ যদি একজনের মধ্যে ফুটে ওঠে, সে ভগবান হয়ে যায়। আমাদের ভিতর সূক্ষ্ম যন্ত্র আছে ঘামাচির মত যা দ্বারা সব বুঝতে পারা যায়। একটা মানুষ ভেড়া হতে পারে, বাঘ হতে পারে। যে কোন জীব যে কোন রূপ নিতে পারে, যদি সেই অংশটা একটু জাগিয়ে তোলে। মনে কর, দশ লক্ষ গ্ল্যাণ্ড আছে। তার মধ্যে ধর, ফুটেছে পাঁচশো। বাকিগুলি খনিতে চাপা পড়ে আছে। দশ লক্ষের মধ্যে পাঁচশো ফুটেছে। তাতেই এখানে কতজন নেতা হয়ে গেছে। ভিতরে যে যন্ত্রগুলো আছে, গ্রহের মত, তারার মত ভিতরে ভিতরে ঝিলিক মারছে। এক একটি জীবের অংশ আছে, গ্ল্যাণ্ড আছে ভিতরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে। এমন একটি স্তর আছে, সেই অংশগুলো যখন জাগে, সেইরূপ নিয়ে নেয়। একটা পক্সের রোগী দেখতে গেছিলাম, অদ্ভুত ফুলে গেছে। এই ফোলা কোথা থেকে এল? মাংস তো বের হয় নাই আবার এরকম ছোটও হতে পারে।

মনে কর, দশ লক্ষ গ্ল্যাণ্ড আছে। তার মধ্যে ধর, ফুটেছে পাঁচশো। বাকিগুলি খনিতে চাপা পড়ে আছে। দশ লক্ষের মধ্যে পাঁচশো ফুটেছে। তাতেই এখানে কতজন নেতা হয়ে গেছে।

মহান, মহাপুরুষ ডিগ্রি হয় কখন? যখন সমস্ত জীবের উপর তাঁর অধিকার হয়। এমন পোকা আছে, যেকোন অবস্থায় যে কোন জীবের চেহারা নিতে পারে। পেছনে দেখলো টিকটিকি, টিকটিকি হয়ে গেল। পেছনে দেখলো ছুঁচো, ছুঁচো হয়ে গেল। যখন দেখে আর কোন উপায় নাই, তখন ঐ রূপ নিয়ে নেয়। ওটাই বিভূতি বা ক্ষমতা। সকলকার মধ্যে ঐ ক্ষমতা আছে। তবে হয় না কেন? আমরা না হওয়ার জন্যই

ঐ যন্ত্রগুলো নিজেরা খেলতে থাকে। তখন উথাল পাথাল শুরু করে। একবার নিয়ে যায় সমুদ্রে, একবার নিয়ে যায় আকাশে। ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ টিপ খুলে যায়।



সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি। না হওয়ার যন্ত্রটা আমরা ঠিক করে রেখেছি। 'হয় না'-র মধ্যেই আমরা টিপ দিয়ে বসে আছি। হয় না, অসম্ভব, এত পাপ, কি করে হবে? সংসারের মধ্যে থেকে কি হয়? অনেক কষ্ট করতে হয়। ঐটায় টিপ দেওয়া আছে বলেই এইসব কথা বের হয়। ঐটা যদি ছুটে যায়, তাহলেই হয়ে যায়। দিনের বেলায় তোমরা কিছু কর না তো, আবার মরার মতন যখন শুয়ে থাক রাত্রে, ঐ যন্ত্রগুলো নিজেরা খেলতে থাকে। তখন উথাল পাথাল শুরু করে। একবার নিয়ে যায় সমুদ্রে, একবার নিয়ে যায় আকাশে। ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ টিপ খুলে যায়। যেটা জাগ্রত অবস্থায় হতো, ঘুমন্ত অবস্থায় সেটা খেলতে থাকে। কাজেই ক্রিয়াটা হয় স্বপ্নের মধ্যে। এমনি বিড়াল দেখলে ভয় পায়, ওদিকে স্বপ্নে বাঘের সঙ্গে খেলা করছে। একজন দিনের বেলা ভাল থাকে। রাত্রে পেট ফাঁপে। দিনের বেলা খায় না। রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে খাইয়ে দিয়েছে। স্বপ্নেই কবিরাজের কাছ থেকে ভাস্কর লবণ নিয়ে আসছে। স্বপ্নেই সন্দেশ, রসগোল্লা ইচ্ছামতন খাচ্ছে। একটা লোক ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, স্বপ্নে খেলে মরে যাবি। তারপর আর স্বপ্নে খায় না।

স্বপ্নে যে মনটা থাকে, জাগ্রত অবস্থায় সেটা থাকে না। কোনরকমে আঁটসাঁট করে স্বপ্নের মনটা যদি জাগরণে আনতে পারা যায়, তবে একদিনেই লটারী পেয়ে যাবে, অর্থাৎ যা খুশী (ইচ্ছে) তাই করতে পারবে। নদীর শেষ আর সাগরের উৎপত্তি। জাগ্রত অবস্থায় মনটা নানা বাধা নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু স্বপ্নে মন অনন্ত সাগরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কোন বাধা নিষেধই তখন মনকে স্পর্শ করতে পারে না। যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা মহান, তাঁরা একবার সাগরে, একবার নদীতে পারাপার করেন। স্বপ্ন আর জাগরণ, যদি এক করতে পার, তবে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। দুটোকে এক করে ফেলতে পারলে যা খুশী তাই করতে পারবে। অদ্ভুত সুন্দর ব্যবস্থা। তবে আবার ভয়ও আছে। যা মনে করবে, তাই হয়ে যাবে। ভাবলে, এই বুঝি মানুষটা উপর থেকে পড়লো, সত্যি সত্যিই উপর

জাগ্রত অবস্থায় মনটা নানা বাধা নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু স্বপ্নে মন অনন্ত সাগরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কোন বাধা নিষেধই তখন মনকে স্পর্শ করতে পারে না। যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা মহান, তাঁরা একবার সাগরে, একবার নদীতে পারাপার করেন।

থেকে পড়বে। মনে করলে, যদি গাড়ীটা আমার উপর আসে? গাড়ীটা তোমার উপর এসে পড়বে। ক্ষমতা পেয়েও ক্ষমতা ঠিক মতন ব্যবহার করতে না পারলে, ফল খারাপ হয়। ক্ষমতা পেলেই আকাম কুকামের দিকে মন যায়। শেষবেলায় মনে হয়, ক্ষমতা না পেলেই ভাল হতো। একজন ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা পেল। সকলকারটা দেখে। নিজেরটা দেখতে গিয়ে দেখে, আয়ু মাত্র তিন মাস। আর একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বিয়ে করবে কিনা দেখতে গিয়ে দেখে, সে থাকবে আর ২৫ বছর। কাজেই জেনে আর বিয়ে করতে চায় না। ক্ষমতাটা যে আটকানো থাকে, তারও কারণ আছে। দেখলে আর সংসার করতে পারবে না। জাগতিক যতসব বস্তু আছে, মন্ত্রের মত ভিতরে গাঁথা আছে। মন্ত্রের মত সমস্ত ক্ষমতাগুলো ভিতরে আছে। যেমন তেঁতুল দিয়ে, লঙ্কা দিয়ে, নুন দিয়ে মাখলে খেতে ভাল লাগে না? এখন তেঁতুলের নামটা চিন্তা করলেই মুখে লালা আসে, ভাল লাগে, এটাই দেখা যাচ্ছে। দেখ, নামের গুণটাই এমন। এই ভাল লাগাটা কেউ কয়, আবার কেউ কয় না। আমাদের মধ্যে দশ লক্ষ যন্ত্র আছে। আমাদের মধ্যে যে গ্ল্যাণ্ডগুলো আছে এগুলো মারপিটে জাগে না। জাগে ধ্বনিতে। আমাদের এখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নাসিকার ডাক চলছে।

আমাদের মধ্যে দশ লক্ষ যন্ত্র আছে। আমাদের মধ্যে যে গ্ল্যাণ্ডগুলো আছে এগুলো মারপিটে জাগে না। জাগে ধ্বনিতে। আমাদের এখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নাসিকার ডাক চলছে।

ঘুম এক জাতীয় সমাধি। যে নাক ডাকা ঘুমের মধ্যে হয়, এমনি অবস্থায় তা হয় না। এমনিতে চেষ্টা করলে অসুবিধা হবে। এখানে সেখানে ব্যথা হবে। ঘুমন্ত অবস্থা সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় নাসিকার ভিতর দিয়ে একটা সুর বইতে থাকে। এটা সহজ কথা নয়। সকলকার এই নাক ডাকার অবস্থা হয় না। ঘুমন্ত অবস্থায় সমাধি অবস্থা যখন পরিণত হয় (গাঢ় হয়) ; যাদের হয়, তাদেরই নাক ডাকে, তখনই নাক ডাকে। নাক ডাকছে আর আপনমনে সমাধিতে শিব পড়ে আছে। একজন খাওয়া দাওয়া করলো, অফিস যাচ্ছে। তবুও দেখছে, ভাই এর নাক ডেকেই

সাপগুলো এই ফাল্গুনী বাতাসে বনেতে এমন সুন্দর একটা নাক ডাকার মত অদ্ভুত শিস দেয়। এই শব্দটা হচ্ছে, ভিতরে যে লক্ষ লক্ষ তারগুলো আছে, ঐগুলোকে যে জীবন্ত রেখেছে, তারই ইঙ্গিত।



চলেছে। এই যে দেড় ঘন্টা নাক ডাকলো সে নিজেও জানে না। টেপ রেকর্ড করে রেখেছে। যখন সামনে এনে দিল, নিজের নাকের ডাক নিজে শুনে লজ্জা পেলো। দেখা যাচ্ছে, ঐ নাসিকা কি করে? অন্যমনস্ক হলেই ওর যে সুর আপনমনে দিতে থাকে। এই যে নাক ডাকা, এর একটা নিজস্ব সুর আছে। সাপগুলো এই ফাল্গুনী বাতাসে বনেতে এমন সুন্দর একটা নাক ডাকার মত অদ্ভুত শিস দেয়। এই শব্দটা হচ্ছে, ভিতরে যে লক্ষ লক্ষ তারগুলো আছে, ঐগুলোকে যে জীবন্ত রেখেছে, তারই ইঙ্গিত। কারণ ওরা এমনি চিৎকার করলে তোমার কিছু হবে না। ঐ সমস্ত অবস্থায় যে সুর হয়, জাগ্রত অবস্থায় কেহ করতে পারবে না। আপনি সেটা সমাধির অর্থাৎ ঘুমের সাহায্য করে সেই সুরে। এটা সহজ বস্তু নয়। এটা বিরাট শক্তির একটা ইঙ্গিত। যখন তুমি সমাধিতে ডুবে থাকবে, ঘুমের মধ্যে আর একটা সুর তোমার মধ্যে গভীরতায় তন্ময়তায় বইতে থাকবে। তার অদ্ভুত সুর। সেই সমাধির শব্দ জাগ্রত অবস্থায় তোমার চেষ্টায় আসবে না। কিন্তু ঘুমের মধ্যে চেষ্টা করে আনতে হয় না। কারণ তখন বিরাট শক্তির সঙ্গে সে যোগাযোগে আছে। সেই সুর আপনমনে এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ভিতর দিয়ে বয়ে যেতে থাকবে। সেই যে মহাসাগরের মহানিনাদের বিরাট ঢেউ, তোমার মধ্যে অহর্নিশ বইতে থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেই বিরাট সত্তা জাগিয়ে দিচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে তোমাকে। সেই সুর জাগ্রত, জীবন্ত, স্বচ্ছ। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই সুরের ধারা ধারাবাহিকভাবে বয়ে চলেছে। এই যে সৃষ্টি, এই যে বিরাট এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, তার অনন্ত শক্তির ধারাকে সেই সুরে আরও সজাগ করে ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সুর আরও জাগিয়ে দিচ্ছে। ভিতরকার তারকাগুলো যখন ফুটবে, ১০ লক্ষ যেদিন ফুটবে, সেদিন বুঝবে কী অতুল ঐশ্বর্য (ক্ষমতা) ভিতরে লুকানো রয়েছে। প্রতিটি গ্ল্যাণ্ডের ফুটবার ইঙ্গিত রয়েছে, আভাষ রয়েছে, ফুটবার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে। স্রষ্টা এমন সুন্দরভাবে সমাধিতে রূপ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা কিছুতেই তার সদ্ব্যবহার করছি না। আমরা বসে থেকে ঝিমাই। ইহা অমূল্য সম্পদ, অমূল্য বস্তুর একটা ইঙ্গিত। এই ঘুমন্ত অবস্থায়, এই সমাধিতে তোমরা স্মরণ করবে। কোন্ শক্তি এমনভাবে আমাদের সজাগ থেকে অন্তরালে নিয়ে যায়? কে আমাদের বাহ্যজ্ঞানরহিত করে দেয়? কোন্ শক্তি আমাদের শিশুর মত

করে রাখে? এই যে মায়ের পেট থেকে চলছে পূর্ণত্বের সম্ভাবনা, এটা তো সহজ স্তর নয়। এটা একটা বিরাট ইঙ্গিত। সাধারণের মধ্যেই হীরার খনি, সোনার খনি রয়েছে। মহাখনির সব অমূল্য রত্নরাজি এই ঘুমন্ত সমাধিতে রয়েছে। মহা অমূল্য বস্তুর সম্পদ আপনি রয়েছে এতে সুসজ্জিত। এই সমাধিরূপ পরম সম্পদকে বের করার জন্যই এই ঘুমন্ত সমাধি। এটা বিরাট শক্তির মহা ইঙ্গিত। এই পরমবস্তুর পরম সন্ধানের জন্য যেটা সহজ সরলভাবে রয়েছে, সেই কারণের কারণকে আমরা জেনে নেব। এটা মহাসম্পদ। এই সম্পদের কাছে রয়েছে সেই সর্প কুলকুণ্ডলিনীরূপে। সেই সর্প হচ্ছে মূলাধার, তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর অনাহত ইত্যাদিক্রমে সহজভাবে যে ব্যবহার করছি, আমাদের ভিতরে সেই মহাশক্তির সুরেই রয়েছে সব পরপর সাজানো। সুর যেখানে সর্প সেখানে। মূলাধারের মূলে যে নার্ভ, তাকেই সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুক্ততা শুধু বিরাটের সাথে যোগাযোগের যোগে যুক্ত হওয়ারই ইঙ্গিত করছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে এই যে সুর আপনমনে প্রবাহিত হয়ে প্রাণকে রেখেছে সজীব, এটা সমাধিতেই রয়েছে। বিরাট স্রষ্টা নিজেকে বের করার উপায় অদৃষ্টের উপর রাখেন নাই। সেটা রেখেছেন অতি সহজসরলভাবে। মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম, ঘুমিয়েই ছিলাম। যখন বিশ্রাম করি, ঘুমন্ত অবস্থায় থাকি।

সুর যেখানে সর্প সেখানে। মূলাধারের মূলে যে নার্ভ, তাকেই সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই যুক্ততা শুধু বিরাটের সাথে যোগাযোগের যোগে যুক্ত হওয়ারই ইঙ্গিত করছে।

স্রষ্টা নিজে আশীর্বাদ করে এই দেহের ভিতরে ঘুম রেখেছেন। স্রষ্টা তাঁর নিজের হস্তে এই সমাধি দিয়েছেন। এই ঘুমের মধ্যে আছে বিশ্বের মহাধ্বনি। ঘুমের মাত্রাটা যদি আমরা জাগ্রত অবস্থায় আনতে পারি, তাহলে অনেক কিছু করা যায়। আমরা যে মাত্রায় ঘুমিয়ে পড়ি, সেটা যদি ১ বা ২ মাত্রায় থাকে, জাগ্রত অবস্থায় তারচেয়ে আরও বেশী মাত্রায় এনে যদি কাজ করি, তাহলে অনেক গভীর স্তরে কাজ (যোগ অভ্যাস) করা যায়। বেশী মাত্রায় এনে কাজ করে বলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। ঠ্যাংটা কেটে ফেলে দিলেও টের পায় না। সমাধিতে টের না পাওয়াটাই নিয়ম। সমাধিতে

আমরা যদি নামের মধ্যে ডুবে থাকি, তার যে কতবড় স্বাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার জন্যই বলেছে, দিনরাত নামের নেশায়, জপের নেশায় তন্ময় হয়ে থাকতে।



একবার বলছে 'আছি,' একবার বলছে, 'নাই'। ঔষধের ক্রিয়ায় আরও গভীর করার চেষ্টা করছি। আমরা যদি নামের মধ্যে ডুবে থাকি, তার যে কতবড় স্বাদ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার জন্যই বলেছে, দিনরাত নামের নেশায়, জপের নেশায় তন্ময় হয়ে থাকতে।

এই যে গাড়ীটাকে চালাতে প্রথমে ১০/১২ জন মিলে ধাক্কা দেয়। পরে একজন ঠেলা মারলেই চলে। কোন প্রকারে ঘুমন্ত অবস্থার মাত্রাটাকে যদি জাগ্রত অবস্থায় জাগিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই সাধনা সফল হল। এই জিনিসটা আনবার জন্যই এত সাধনা। পাহাড়ে পর্বতে এত হোম, যাগ-যজ্ঞ কিসের জন্য? বেদে (সাপুড়ে) যখন সাপকে জাগায়, বেদে (সাপুড়ে) বাঁশী বাজায় কেন? বাঁশীর সুর সাপ শোনে না। কারণ সাপের কান নেই। সাপ তাকিয়ে দেখে। জিহ্বা দিয়ে শোনে। ওদের জিহ্বায় ফুটো আছে। জিহ্বা দিয়ে শুনে ফঁস ফঁস করে আস্তে আস্তে উঠতে থাকে। এটাকে জাগাবার জন্যই নিয়ম কানুন। মন চঞ্চল থাক, বিক্ষিপ্ত থাক, ক্ষতি নেই। শুধু আমি জপের মধ্যে ডুবে থাকবো, এই দৃঢ়তা থাকা চাই। শুধু স্মরণ করলেই হয়ে যাবে। প্রথম নিয়মটাই হচ্ছে স্মরণ করা। বিস্মরণ হবেই। মনের অন্যদিকে যাওয়াটাই নিয়ম। মন যত যে দিকেই যাক, চঞ্চল থাক, ওটাই প্রকৃতির নিয়ম। তুমি যখন বসবে, সুরটা ইচ্ছামতন চলছে নানান দিকে। তুমি একদিকে 'ও' (সুরটা) আর একদিকে। তুমি শুধু এই খেয়াল রাখবে, 'আমি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক জপ করে যাব'। জপ এমন জিনিস একটু বসলেই কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে মন চায় একটু স্বাদ। যদি একটু ঝিলিক টিলিক মারতো, উৎসাহ আরেকটু বাড়তো। অন্তরের স্বাদ সব সময় উপলব্ধি করা যায় না, দেখা যায় না। এত সূক্ষ্ম বস্তু, খালি চোখে দেখা যায় না। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে স্মরণে মননে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া। যা কিছু আছে, সবটাই সুর, সবটাই ক্ষেত্র। এর ভিতরে যে অনন্তশক্তি আছে, তা এখানেই (এই দেহেই)। শুধু এটাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। যেখানে যত মহাপুরুষ হয়ে গেছেন এই নিয়েই কাজ (জপ) করেছেন।

তুমি শুধু এই খেয়াল রাখবে, 'আমি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক জপ করে যাব।' জপ এমন জিনিস একটু বসলেই কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে মন চায় একটু স্বাদ। যদি একটু ঝিলিক টিলিক মারতো, উৎসাহ আরেকটু বাড়তো।

ভোগ করলেও বড় হয়েছেন, ত্যাগ করলেও বড় হবেন। এই বিরাট ব্যাপার। এতে (ত্যাগে, ভোগে) কোন কিছুতেই আটকায় না। সব সময় কাজ (জপ) করে যাবে।

সব সময় খেয়াল রাখবে, এই যে সৃষ্টি, কি তার উদ্দেশ্য? এই যে সৃষ্টি, শুধু এলাম আর গেলাম, এরজন্য শুধু সৃষ্টি হয় নাই। এই সৃষ্টির, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অদ্ভুত রূপ রয়েছে। এই অগণিত গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য শুধু কি রোদ পোহাবার জন্য? এতবড় ব্যাপার। ঘুম থেকে উঠে দেখছো, এত বড় সূর্য উঠছে, আবার দিনের শেষে ডুবে যাচ্ছে। সূর্যের একটা তেজের ধাক্কায় সৃষ্টি হয় কত পৃথিবী। তাহলে এই তেজটা, এই সূর্য যা থেকে এলো, তার তেজটা কত বড়। এমন তেজ রশ্মির কণা আকাশে বাতাসে ভর্ত্তি। প্রতি বালুকণাতেও সেই তেজ। সেটা নড়ে না বলে মনে কোর না মরে গেছে। প্রত্যেকটাতেই চৈতন্য আছে; প্রত্যেকটাই সজাগ। তেজ হতে যা সৃষ্টি, সব সজাগ, সব জীবন্ত। যে জিনিসের ক্ষয় আছে, লয় আছে, পরিবর্তন আছে, সেই জিনিসের প্রাণ আছে। দেহ পরিবর্তন হয়। একটা অবস্থা হতে আর একটা অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। মরে কেটা? পরিবর্তন হয়। এই মরলো, তারপর দেহটাতে পচন ধরলো; হাজার হাজার পোকা বের হলো। ওরা (পোকাগুলি) এতদিন কোথায় ছিল? মরলো কই? পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। একরূপ হতে আরেকরূপে পরিবর্তন। বীর্য কীট ছিল এতটুকু। তা হতে কত পরিবর্তন একই জীবনে দেখলে। ২/৪/৫ বছরের দাঁত। সেই দাঁত দিয়ে কত কিছু খাবার খেতে। সেই রূপগুলি সেই দাঁতগুলি এখন গেল কোথায়? এগুলো সবই যেমন পরিবর্তন, তেমনই কেউ মরে না। জন্ম আর মৃত্যু হচ্ছে উদয় আর অস্ত। সূর্য কখনও ওঠে না, নামেও না। সূর্য চির উদীয়মান। এটাও ঠিক তাই। আমরা ঘুরে মরতে আছি। প্রাণ ঠিকই আছে। আমরা যে ঘুরি, সেটা বুঝি

এই অগণিত গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য শুধু কি রোদ পোহাবার জন্য? এতবড় ব্যাপার। ঘুম থেকে উঠে দেখছো, এত বড় সূর্য উঠছে, আবার দিনের শেষে ডুবে যাচ্ছে। সূর্যের একটা তেজের ধাক্কায় সৃষ্টি হয় কত পৃথিবী।

জন্ম আর মৃত্যু হচ্ছে উদয় আর অস্ত। সূর্য কখনও ওঠে না, নামেও না। সূর্য চির উদীয়মান। এটাও ঠিক তাই। আমরা ঘুরে মরতে আছি। প্রাণ ঠিকই আছে।



না। বলি, সূর্য উঠছে আর নামছে। সূর্য এক জায়গায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। ও ঠিক আছে। মরবে কেটা? ওর (সূর্যের) জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ওটাই চলছে আবহমান কাল হ'তে। সেই কবে হ'তে যে শুরু হয়েছে, গ্রহ, উপগ্রহগুলি আজও লাইন দিয়ে সূর্য পরিক্রমা (সূর্যকে ঘুরে) করে চলেছে।

নিজেদের অজ্ঞতায় আমাদের বিভ্রান্তিতে আমরা দেখি সূর্যের উদয় অস্ত। জন্ম মৃত্যু। সেটারও উদয় অস্ত নাই। এটারও জন্ম মৃত্যু নাই। শুধু বুঝাবার জন্যই উদয়, অস্ত, জন্ম, মৃত্যু বলি। তোমরা সহজে বুঝে নেবে। এই পৃথিবীটা হুম্ হুম করে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণিপাকে আমরা উদয় অস্ত দেখছি। এই জন্ম মৃত্যুও ঠিক তাই। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, যতদিন পর্যন্ত এই ১৬ মাত্রায় না আসবে, ১৬ মাত্রার তালে তাল না মিলবে ১/২/৩/৪, ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে ঘুরতে হবে। ১৬ মাত্রায় যেতে আর পারে না। কাজেই তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ঘুরতে হবে। তৈরী না হওয়ার জন্য এই ফ্যাসাদ। যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমরা এসে মিলিত হও। এই মিলনে এক একজন বিরাট স্রষ্টা হয়ে এস। এটাই উদ্দেশ্য স্রষ্টার। স্রষ্টার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। ইঞ্জিন তো চলছে। নারদ সংসার করতে গিয়েছিল। দেখে সর্বত্রই মহামায়ার খেলা, মহামায়ার প্যাঁচ। নারদকে এমন প্যাঁচ দিলেন যে, এক ডুবে ১২ বছর। স্নান করতে গিয়ে নারদ একটা ডুব দিয়েছে। ডুব দিয়ে উঠে নতুন জায়গায় নতুন জীবন, ঘর সংসার শুরু করে দিয়েছে। আটটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে নারদের বিরাট সংসার। এদিকে ১২ বছর কেটে গেছে। আবার একদিন স্নানের জন্য ডুব দিয়েছে। ডুব দিয়ে উঠেছে আগেকার সেই পুরানো জায়গায়। নারদের আগেকার জীবনের কথা মনে পড়ে গেছে ১২ বছর পর। এমনই মহামায়ার প্যাঁচ। এই ছকটা ছাড়াবার জন্যই আঁটঘাট বাঁধতে হবে। এই দেহযন্ত্র এমনই সুরে বাঁধা, আপনিই হবে। সৃষ্টির নিয়মে মাত্রায় মাত্রায় কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে এতগুলো শিরা, এত রগ আছে। প্রতিটি রগের আবার বিভিন্ন রাগ (শাস্ত্রীয় সঙ্গীত) আছে। গাঁইয়া ভাষায়

সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, যতদিন পর্যন্ত এই ১৬ মাত্রায় না আসবে, ১৬ মাত্রার তালে তাল না মিলবে ১/২/৩/৪, ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে ঘুরতে হবে। ১৬ মাত্রায় যেতে আর পারে না। কাজেই তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ঘুরতে হবে।

শিরাকে বলে রগ। প্রতিটি রগের রাগ, রাগিনী আছে। এই রাগ রাগিনীতেই আছে সব। মেজাজের সময় একরকম, খুশীর সময় আরেকরকম। কখনও সন্দেহ, কখনও দ্বন্দ্ব, কখনও সমস্যা, কোনটারই স্থায়িত্ব নাই। এই রগে সুরের রাগ রাগিনী আছে। রক্তের মধ্যে লাল জিনিস আছে। রক্তের নিজস্ব রং সাদা। অন্য জিনিস মেশানো আছে ব'লে রক্তের রং লাল। শিরা, উপশিরার ভিতর দিয়ে রক্ত যখন প্রবাহিত হয়, রক্তের এই প্রবাহে রাগ রাগিনী আছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে শিরার স্পন্দনের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সজাগ করে দিচ্ছে। এই যে ধক ধক, খট্ খট্ হার্ট চলছে, লাংস চলছে, এগুলি কিসের জন্য? বিশ্বের রাগ রাগিনীর সঙ্গে মিলবার জন্য। নিজের শব্দ নিজে শোন। যেটা থেকে হার্টটা সংকোচন আর প্রসারণ করছে, ধুক্‌ধুক্ করছে সেই শব্দ শোন। এই শব্দগুলো প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ করে দিচ্ছে। এই দেহযন্ত্রকে প্রাণময় করে রেখেছে, চৈতন্যময় করে রেখেছে। একে বাজাও। তোমরা জাগাও এই যন্ত্রকে, এই দেহবীণাযন্ত্রকে। এই যন্ত্রের প্রতি শিরায় উপশিরায় রগের টানে টানে টান দাও। এই টানের টানে মহাটান, মহা নিনাদের সুর আছে।

রক্তের মধ্যে লাল জিনিস আছে রক্তের নিজস্ব রং সাদা। অন্য জিনিস মেশানো আছে ব'লে রক্তের রং লাল। শিরা, উপশিরার ভিতর দিয়ে রক্ত যখন প্রবাহিত হয়, রক্তের এই প্রবাহে রাগ রাগিনী আছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে শিরার স্পন্দনের মধ্য দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সজাগ করে দিচ্ছে।

অনন্ত সুরের গতিটা এই শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এমন সুন্দরভাবে সে সজাগ, এমন মধুময় চৈতন্য সেখানে যে বুঝতে পারলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে সে (সুর) সহজভাবে বয়ে চলেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে কণিকায় কণিকায় সেটি বিদ্যমান রয়েছে। প্রতি রক্ত কণিকায় সৃষ্টির বীজ রয়েছে। প্রতি রক্ত কণিকায় সৃষ্টি হয়েছে। এই রক্ত হতে বীর্য এল। এই লক্ষ লক্ষ জীব রক্তের ধারা হতে সৃষ্টি হয়েছে। এই রক্ত মহাশক্তির সঙ্গে তোমাকে মিশিয়ে দেওয়ার

রক্ত যিনি পান করেন, কালী, তারা, মহাবিদ্যা রক্তপান করছেন কিসের জন্য? রক্তের যে লীলা, সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য, রক্তময় হয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি রক্তপান করেছেন। কত বড় চৈতন্যশক্তি, এর মাঝে অন্তর্নিহিত।



জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। রক্ত যিনি পান করেন, কালী, তারা, মহাবিদ্যা রক্তপান করছেন কিসের জন্য? রক্তের যে লীলা, সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য, রক্তময় হয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি রক্তপান করেছেন। কত বড় চৈতন্যশক্তি, এর মাঝে অন্তর্নিহিত। সমস্ত জীবের রক্ত লাল। সমস্ত জীব জাতি একজাতি। সে যাই হোক, সমস্ত জীবের রক্ত লাল। সেখানে তোমার সাথে আমার কোন দ্বন্দ্ব নাই। আমরা সবাই এক ধর্ম, এক জাতি, এক নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছি। তাই সজাগ করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তে। সমস্ত বিষয়বস্তুর বস্তুত্বের মধ্যে সেই রক্তের সুরের সাড়া, রাগের সাড়া রয়েছে, বিশ্বের সেই মহা সুরের সঙ্গে মিশাবার জন্য। সরস্বতীর হাতে মহাবীণা যন্ত্র। সেই যন্ত্র হচ্ছে এই দেহবীণা যন্ত্র। দেবর্ষি নারদ বাজিয়ে গেছেন সেই যন্ত্র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে অহর্নিশ বাজিয়ে গেছেন। আমরাও যেন এই দেহবীণাকে বাজিয়ে একরকমভাবে সজাগ করে এমনিভাবে সকলকে জানিয়ে যেতে পারি। সেই ধ্বনির সেই সাড়ার সাড়া অবিরাম গতিতে, ঝরণার গতিতে, ঝরণার ফোয়ারার মত আপন সুরে আপন স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে, আমার আমিত্বকে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আবার আমিত্বকে বিভক্ত করে নিজস্ব সত্তাকে জানিয়ে দিয়ে জাগরণে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য সে আপনমনে চেষ্টা করছে। সেই প্রচেষ্টার গীতগান করে আমরা যেন এই বীণাযন্ত্র বাজিয়ে যেতে পারি। এমন মধুর যন্ত্র আর পাওয়া যায় না। এই যন্ত্র যেন আমরা অপব্যবহার না করি। অপব্যবহারে যন্ত্র যেন নষ্ট না হয়।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

# জড় আর চৈতন্য একই সুরে আবদ্ধ

**রাজা বসন্ত রায় রোড**

**০৮-০৯-১৯৫৩**

একই জায়গায় দুটি বীজ বপন করলে যার যার সত্তা অনুযায়ী মাত্রামাফিকভাবে ক্ষেত্র হতে রস টেনে নিচ্ছে এবং যার যার স্বাদের পরিচয় দিচ্ছে। যেমন ইক্ষুর মিষ্টত্ব, নিমের তিক্ততা, তেঁতুলের অম্লত্ব ইত্যাদি। একই ক্ষেত্রে (মাটিতে) এইভাবে টেনে নেওয়ার কি কারণ? এই বিশ্ববিরাট, এই ব্রহ্ম কতভাবে, কতরূপে নানা বিকাশে এই বিরাটেরই রূপ প্রকাশ করছে। বিশ্বের এতগুলি রূপ, এতগুলি ধারা, দ্বন্দ্ব, সমস্যা সব যে লুক্কায়িত রয়েছে, সৃষ্ট বস্তু সমূহের মাধ্যমে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এতটুকু বীজ তার ভিতর যে এত ডালপালা, শাখাপ্রশাখা ইত্যাদি রয়েছে, এত গুণ, এত তেজ রয়েছে দেখলে বুঝা যায় না। মাটির সংস্পর্শে এলে আস্তে আস্তে ধরা যায়। দৃষ্টি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মন, চিন্তা ইত্যাদি সবই সেই বস্তুর দিকে চলে গেল। যার ভিতর দিয়ে এই দৃষ্টিতে ফিরে এল, সেই জিনিসটুকু কি? বহনকারী এই যে সূক্ষ্ম পদার্থ তার (দেহের) ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, সে তো চৈতন্য। একটি চৈতন্যের সাথে আর একটি চৈতন্যের মিলন না হলে মিশে যায় কি করে? যে বেরিয়ে গেল, সে কোথায় গেল? মনে কর, বিশ্ব বিরাটেতে কতগুলো তার আছে। তোমার ভিতরে আর একজাতীয় তার আছে। দুই তার প্রবেশ করলো বলে দৃষ্টি দ্বারা সব তুমি দেখতে পেলে। তেমনি শ্রবণে, দর্শনে, ঘ্রাণে কেবল তারের সঙ্গে তারের মিলন। সর্ব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই তাই। এইভাবে মিলে মিশে সব একাকার হয়ে যায়। যার সঙ্গে মিশলো, তাহা চৈতন্য। সেই চৈতন্য বাতাসে, জলে, স্থলে, তোমাতে, আমাতে, বিশ্ব বিরাটেতে, মাটিতে, পাথরে, সর্বত্র আছে। একটা লোক পঞ্চাশ রকমভাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। জ্যেঠা, খুড়া, দাদা, মেসো, মামা ইত্যাদি যত নামেই ডাকুক না কেন, একটা লোকই সাড়া দিচ্ছে। পাগল

একই জায়গায় দুটি বীজ বপন করলে যার যার সত্তা অনুযায়ী মাত্রামাফিকভাবে ক্ষেত্র হতে রস টেনে নিচ্ছে এবং যার যার স্বাদের পরিচয় দিচ্ছে। যেমন ইক্ষুর মিষ্টত্ব, নিমের তিক্ততা, তেঁতুলের অম্লত্ব ইত্যাদি।

জড় ও চৈতন্য একই সুরে আবদ্ধ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে অনন্ত সৃষ্টবস্তু মাত্রামাফিক যার যার প্রয়োজনীয় বস্তু টেনে নিচ্ছে। বহু জীবজন্তু রক্ত শুষে আহার যুগিয়ে নেয়।



হওয়ার কথা। এটা হচ্ছে কি করে? একই বাঁধনে বাঁধা যে সব। নানা মাত্রায় মাত্রায় সব বাঁধা রয়েছে। ১০০° ডিগ্রী, ৯৯° ডিগ্রী, ৯৮° ডিগ্রী, ৯৭° ডিগ্রীতে দেখা গেল, প্রত্যেকেই এক এক জায়গায় আটকা আছে। এইভাবে শেষে দেখা গেল, ৫° ডিগ্রীতে পাথর পর্যন্ত হয়। এই ৫° ডিগ্রীর অবস্থা হচ্ছে বিরাট অবস্থা। জড় ও চৈতন্য একই সুরে আবদ্ধ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে অনন্ত সৃষ্টবস্তু মাত্রামাফিক যার যার প্রয়োজনীয় বস্তু টেনে নিচ্ছে। বহু জীবজন্তু রক্ত শুষে আহার যুগিয়ে নেয়।

কতদিন বাদে দেখা গেল, তুমি এখানে নেই। সেখানে (মহাশূন্যে) গিয়ে বসে রইলে। এখানকার তোমার সেখানে যে রূপ হইল, সেটাই বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। তোমাকে একদিন খুঁজে পাওয়া যেত না। তুমি আকাশে বাতাসে মিশে ছিলে। এখন তুমি ২৫ বৎসর/৩০ বৎসরের। এই যে অবস্থা পরিপুষ্টি সাধনে মনের একাগ্রতায় এটা সম্ভব। আবার ধীরে ধীরে মিশে যাওয়ার অবস্থায় চলেছি আমরা। এইভাবে মৃত্যুর পর দেহ হতে চৈতন্য আস্তে আস্তে মিশে গেল। কোথায় গেল? শব (মৃতদেহ) হতে পোকার Requirement; মৃতদেহ হতে অজস্র পোকার উদ্ভব হলো। প্রত্যেকটির ৫° ডিগ্রী মাত্রা। প্রত্যেকটির ভিতর সুবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি সব আছে। কোনমতে আটকে আছে কেবল। এই বিশ্ববিরাটেতে যা কিছু দেখছো, শুনছো, সবই একভাবে বাঁধা। কাজ সবাই করে যাচ্ছে। শুধু ভাবতে হবে, তুমি কি করে যাচ্ছ? এখন পান, বিড়ি, সিগারেটের সুর কেবল দেখা গেল। নিমাইয়ের সুর এখনও আসে নাই। দর্শকবৃন্দ 'আহা আহা' করতে থাকলে আনন্দে সুর বের হতে থাকে। প্রথম প্রথম একটু বেসুর দেখা দেবেই। ধাক্কা খেতে খেতে বেসুর আবার সুরে আসবে। শুধু নজর রাখবে, হাল যেন ঠিক থাকে। তোমরা এখন মঞ্চে নিমাইয়ের পার্ট করছো। গুড় গুড়িও টানো, হালও ঠিক রাখো, তবেই হবে। একটা নিয়ম পালন করে কয়জন সাধনা বা কসরৎ করে? কার্যক্ষেত্রে কিছুই নাই। শুধু শূন্যে মারামারি।

ধাক্কা খেতে খেতে বেসুর আবার সুরে আসবে। শুধু নজর রাখবে, হাল যেন ঠিক থাকে।

জলের স্রোতে যে পলিমাটি আসে, তাতে সব গর্ত ভরে যায়। আমাদের ভিতর সেইরূপ স্রোত বইয়ে দিতে হবে। নতুবা বুঝের গর্ত অবুঝে ভরে যাবে।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

# আমাদের নিজেদের রূপ বিশ্বরূপের দর্পণস্বরূপ

**নতুনপল্লী, বর্ধমান**
**২৬-০৪-১৯৫৮**

এই পরিদৃশ্যমান জগতে চৈতন্যের সাড়া নিয়ে এসেছ, সেই চৈতন্যে সচেতন হওয়াই সাধনা। জীবনযাত্রার পথে ইন্দ্রিয়ের জ্বালা যন্ত্রণা মাঝে মাঝে মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, মাঝে মাঝে যে নৈরাশ্যের মাঝে নিয়ে যায়, তাতে যে চিত্ত বা মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেই অস্থির চিত্তের জন্য বিচলিত না হওয়াই সমীচীন। এটা প্রকৃতির নিয়ম, এটা স্বভাবজাত। সুতরাং তোমার ভাবনা থাকবে কি করে সেই সাড়াকে বা সেই সুরকে জাগানো যেতে পারে। অবশ্য সেই সুর বা সাড়া সবাই জন্মের সাথে সাথেই নিয়ে আসে। খনিজবস্তু যেমন খনন করে বের করতে হয়, তেমনি ভিতরকার তত্ত্ববস্তুকে খনন করে বহিষ্কৃত করতে হয়। এটা অজানার সমতলে থাকে। অজানার গভীরতায় জানার বস্তু থাকে — অজানা জানারই ইঙ্গিত। অন্ধকার আলোর ইঙ্গিত। এই জ্ঞানসূর্যে এই অজ্ঞানতার অন্ধকারের ধার দিয়ে পৌঁছতে হয়। অজানা বা অজ্ঞানতা অস্বাভাবিক নয়, এটা ভাববার বিষয় নয় — এটা বিশ্বভাবেরই ইঙ্গিত স্বরূপ। এটা আভাষের আভাষ। তাই রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা বা অবসান প্রতিক্ষণে, সেকেণ্ড বা মিনিটের কাঁটার মতো জানিয়ে দিচ্ছে, কি করে যাওয়া যায় সেই জানা বস্তুতে। এই বিশ্বরূপে রয়েছে জানার রেশগুলো। নিজের রূপ বিশ্বরূপের দর্পণস্বরূপ। — নিজের

জীবনযাত্রার পথে ইন্দ্রিয়ের জ্বালা যন্ত্রণা মাঝে মাঝে মনকে যে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, মাঝে মাঝে যে নৈরাশ্যের মাঝে নিয়ে যায়, তাতে যে চিত্ত বা মন বিক্ষিপ্ত হয়, সেই অস্থির চিত্তের জন্য বিচলিত না হওয়াই সমীচীন। এটা প্রকৃতির নিয়ম, এটা স্বভাবজাত।



তাই রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা বা অবসান প্রতিক্ষণে, সেকেণ্ড বা মিনিটের কাঁটার মতো জানিয়ে দিচ্ছে, কি করে যাওয়া যায় সেই জানা বস্তুতে।

রূপই বিশ্বরূপের প্রতিনিধিস্বরূপ। তোমাকে খুঁজলেই সব খোঁজ মিলবে। নিজেকে খোঁজ, নিজেকে জানো। 'কি করে এলে'? — সেই সন্ধানে সন্ধানে চলে যাও। তখনই তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমা হতে আসবে। এই সমস্যার সমাধান এই নীতিতে আছে। সংস্কারবর্জিত হয়ে প্রকৃতির নিয়মাবলীর মাঝে থেকে তোমার সপ্তপর্দায় তুমি টান দাও। এই সপ্তপর্দায় আছে বিশ্বের সুর।

মূলাধারের মূলগ্রন্থিতে সেই মূলমন্ত্র রয়েছে। সেই মন্ত্রকেই সেই সুরের দ্বারা জাগাতে হবে সহস্রারে। তবেই সহস্রধারা প্রস্ফুটিত হবে। সেই সুরের ধ্বনিই নাদ বা মন্ত্র — একই গ্রন্থিতে গ্রথিত। তুমিও যে সেই নাদেরই নাদ, তখন বুঝতে পারবে।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

# তোমাদের মুক্তি অনিবার্য।
# কারণ এই জীবনই শেষ জীবন

**পাম এ্যাভিনিউ**
**২১-০৩-১৯৬৫**

ছোট একটা ঘটনা বলছি। কোথায় কোন সময় আর কিছু বলার দরকার নেই। কোন এক জায়গায় শিবের মত বিরাট বিরাট মহান বসেছেন। আরও কয়েকজন তাদের ভক্ত সেখানে ছিল। শুধু এই পৃথিবীর নয়, অনন্ত জগতের কথা আলাপ হচ্ছিল। এই জগৎ কোত্থেকে এল? এই যে অগণিত পৃথিবী, অগণিত জীব, অগণিত সৃষ্টি, কি করে এল? এর সমাধান কি? এক মহান বলে উঠলেন, 'আমি ১০০৮টা পৃথিবী দেখছি। তাদের গতির ভার আমার উপর।' আর এক মহান বললেন, 'সমস্ত জগতের কল্যাণ কি করে হয়, তার চেষ্টা করছি।' আর একজন বলছেন, 'যত লোক জপ করছে, তার হিসাব আমি করছি।' আর একজন বলছেন, 'আমি নিজে মানুষ। মানুষ যাতে জন্ম না নেয়, আদৌ যাতে জন্ম না নেয়, তার চেষ্টা করছি।' আর সব কথা যে যা বলছেন, লিখছেন একজন। যিনি ১০০৮টা পৃথিবী দেখছেন, তিনি একটা পৃথিবীতেই আছেন। তিনি যখন যে পৃথিবীর কথা ভাবছেন, ভাবনার সাথে সাথে দেহ গঠন করে নেন।

তোমাদেরও ভাবনার সাথে সাথে দেহ যে গঠন হয় না, তা নয়। ধোঁয়ার মত বেরিয়ে যায়, জমাট বেঁধে থাকছে না। তাদেরটা (মহানদের দেহ) জমাট হয়ে যায়। জল যখন বাষ্প হয়ে যায়, যাওয়ার সময় দেখা যায় না। যখন শিলা বৃষ্টি হয়, তখন বুঝি। যাওয়ার রাস্তা ফাঁকা। দেখা যায় না যখন যায়।

জমাট বাঁধবার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে দেখতে পেতে তোমাদের ঠাকুর এইসময়ে বহুরকমভাবে বহু জায়গায় ক্লাস করছেন। একিরে বাবা। এই ক্ষমতা শুধু মহানের নয়, সবারই আছে।



মনটাও ঠিক সেইরকম, জলের মতন। জমাট বাঁধবার যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে দেখতে পেতে তোমাদের ঠাকুর এইসময়ে বহুরকমভাবে বহু জায়গায় ক্লাস করছেন। একিরে বাবা। এই ক্ষমতা শুধু মহানের নয়, সবারই আছে। আনন্দ বল, দুঃখ বল, সব মনেরই খেলা। মনন শক্তি বড় শক্তি। এর দূরত্বটা বিস্তৃতিটা (ব্যাপকতা) মাপা যায় না। মনন শক্তিটা জমাটের জন্য যা দরকার, তা যদি ঠিকভাবে তৈরী করে নেওয়া যায়, জমাট ঠিক বেঁধে যায়। মনন শক্তিতেই রক্তচোষা দূর থেকে রক্ত টেনে নেয়। চারিদিক হতে সকলে ঘিরে রক্ত শুষে রক্ত বের নেয়। ফাঁকা জায়গা দিয়ে দূর থেকে কি করে যে রক্ত খায় বুঝা যায় না। রক্ত খেয়ে লাল হয়ে যায়। বড় বড় জন্তু শুকিয়ে একেবারে রক্ত শূন্য হয়ে যায়; এত আকর্ষণ শক্তি। এই যে মাছি, এত অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি দূর থেকে বুঝতে পারে। এই যে ক্ষমতার বিকাশ, স্রষ্টা সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই তার প্রকাশ করেছেন। অগণিত সৃষ্ট জীবের প্রত্যেকের ক্ষমতা প্রত্যেকের মধ্যে আছে। ২/৩ মাইলের মধ্যেও মাছি নেই। কিন্তু একটা আম কাটলে বা কাঁঠাল ভাঙলে ঠিক সবুজ মাছি এসে হাজির হবে। সাপও তাই। ৩০/৪০ মাইল দূরে গিয়ে প্রতিহিংসা নেয়। আবার কুকুরের ক্ষমতা দেখ। লালবাজারের কুকুর খুনীকে ধরিয়ে দিচ্ছে। এই শক্তি কোত্থেকে এল?

এই যে ক্ষমতার বিকাশ, স্রষ্টা সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই তার প্রকাশ করেছেন। অগণিত সৃষ্ট জীবের প্রত্যেকের ক্ষমতা প্রত্যেকের মধ্যে আছে।

বিশ্ব প্রকৃতির এই ক্ষমতাটা শুধু মাছির মধ্যে নয়, কুকুরের মধ্যে নয়, প্রত্যেক জীবের মধ্যে আছে। স্রষ্টা বিশ্ব প্রকৃতির ক্ষমতার কিছুটা প্রাণীর ভিতর প্রকাশ করেছেন, শুধু বুঝিয়ে দেবার জন্য। এইরকমভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ হতে হতে বহু শক্তির বিকাশ দেখা যায়, অন্তর্যামিত্বও তাই। গাছ বেশ টের পায়। প্রত্যেকটি গাছ এত বুঝে যে একটা ফুল ছিঁড়লে ব্যথা পায়। ৩০ বছর পর একটা বুড়ো সেই গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। গাছ আনন্দে নড়ছিল। ৩০ বৎসর আগে সেই ব্যক্তি ঐ গাছ থেকে ফুল

আকাশপানে তাকিয়ে আছে বলেই বিশ্বের একটা সুপ্ত আনন্দ টেনে নেয়। এক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও গুছিয়ে নিতে অসুবিধা হয় না। এরজন্য ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে।

তুলেছিল। ঐ যে লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর (গাছের) উপর, অসুবিধা হয় না। একটা মানুষ যা বুঝে, তারচেয়েও বেশী বুঝে গাছ। আকাশপানে তাকিয়ে আছে বলেই বিশ্বের একটা সুপ্ত আনন্দ টেনে নেয়। এক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও গুছিয়ে নিতে অসুবিধা হয় না। এরজন্য ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে। তাকে কাটছে, ছিঁড়ছে প্রতিবাদ করছে না। কারণ পৃথিবীর যে গতিটা আছে, সেই গতির সাথে গতি মিলিয়ে ওরা (গাছেরা) নিজেরা নিজেদের সাজিয়ে তোলে; নিজের গভীরতায় ডুবে থাকে। প্রকৃতির এই যে দান, কিসের জন্য? প্রকৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তোমাদের ভিতর ধীর স্থির অবিচল ভাবে অটলভাবে এক জায়গায় বসে সাধনা করবার ক্ষমতা আছে। এই যে সূর্যের তেজ, চন্দ্রের তেজ — প্রকৃতি দেখিয়ে দিচ্ছেন, যতগুলি সূর্য আছে, তার তেজ আছে, তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই তেজ আছে। এটাকে বুঝাবার জন্য স্রষ্টার এই প্রয়াস; এত প্রাণী, এত সৃষ্টি।

ঐ যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহান, অবতার যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই একত্রিত হয়ে এই অনন্ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা ধরে ধরে আলাপ আলোচনা করছিলেন। এই যে সৃষ্টি চলছে, এই যে অগণিত পৃথিবী আছে, তাতে যে প্রাণী আছে, তাদের কিভাবে রক্ষা করা যায়, কি করে তাদের ভাল করা যায়, তাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সঙ্গে কি করে এক করে দেওয়া যায়, স্রষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে তাদের উদ্দেশ্য কিভাবে এক করে দেওয়া যায়, এইসব সমস্যার সমাধান করাই তাঁদের কাজ।

আলাপ প্রসঙ্গে এরমধ্যে একজন বলছেন, তোমার চেয়ে আমারটাতো কম নয়। আর একজন, এই যে সবার জপ আমি গুণছি, তাতো কম নয়। আমি শুধু জপ গুণছি। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক জপ যে করছে, সমস্ত জগতে তার হিসাব হয়। আমি জপ করছি, মন বসুক না বসুক, তাতে কি হবে? এই যে কর্মচারীরা টাকা গুণছে, টাকা তাদের নয়, কিন্তু টাকা গণনা তো ঠিক হয়। যে লোক ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক জপ করছে, আমি গুণছি। এমন একটি সংখ্যায় যদি পৌঁছে যায়, তাকে একটা স্থান দেব।

আমাদের দেশে নদীতে চর পড়ে দেশ হয়ে যায়। অনেকগুলি বালুকণা



স্রষ্টা কণাগুলো পাঠিয়ে ছিলেন বলেই পৃথিবী হলো। সেই কণা শক্তি অনন্ত কণাশক্তি এক হলে তাতে গণনা যদি থাকে, জপের শব্দগুলি এক জায়গায় যদি গুণে রাখি, তবে সেই মাত্রায় পৌঁছালে সেখানে গেলে আর জপের প্রয়োজন হয় না।

একত্র হয়েই তো এই পৃথিবী। এই পৃথিবী উড়তে থাকলে কতকগুলি কণাও উঠতে থাকবে। স্রষ্টা কণাগুলো পাঠিয়ে ছিলেন বলেই পৃথিবী হলো। সেই কণা শক্তি অনন্ত কণাশক্তি এক হলে তাতে গণনা যদি থাকে, জপের শব্দগুলি এক জায়গায় যদি গুণে রাখি, তবে সেই মাত্রায় পৌঁছালে সেখানে গেলে আর জপের প্রয়োজন হয় না। শুধু স্মরণে থাকে এই হিসাবে আমি সবার মুক্তির পথ করছি।

আর একজন বলছেন, ধ্যান ধারণার ভিতর দিয়ে দেবদর্শন হবে। আর একজনের বক্তব্য, দেবদর্শনের জন্য যেভাবে একনিষ্ঠ হওয়া দরকার, তা এই জগতে থেকে হয় না। কাজেই তাদের পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তাতে জীবের কোনদিন হবে না। কারণ তারা ইন্দ্রিয় রসে ডুবে থাকে। ভগবানের চাহিদা আমাদের পক্ষে বড় নয়। তাহলে সকলেই তাকে ডাকতো। এই গণনা, এই যে একদিন, দুদিন করে দিন যাচ্ছে, কেউ কি তাতে মন দেয়? কিন্তু বয়স তো আটকাচ্ছে না। বার্দ্ধক্য তো রোধ হচ্ছে না। জন্ম থেকে একদিন, দুদিন করে ৬০/৬৫ বছর হয়ে যাচ্ছে। তারপর মৃত্যু। সেটা তো কেউ রোধ করতে পারছে না। জপও যদি সেই রকমভাবে করে যায়, তবে সেই গণনাতে তারা একটা সীমানায় পৌঁছালে আমি তাদের মুক্তির পথ করে দেব। কারণ অন্তর্যামিত্বহীন জীবের পক্ষে সব বুঝা এবং বুঝে করা সম্ভব নয়। সমস্ত গণিতের মাঝে এই অমাবস্যা পূর্ণিমা হচ্ছে। গণিতের মাঝেই সব চলেছে। তাই যদি হয়, আমাদের জীবনের পথে আমরা যদি গণিতের মধ্য দিয়ে পথ করে নিই, তবে সেই কাজ হবেই। সেই মহান হিসাব করে দেখালেন, যিনি ধ্যান-ধারণা দেখছেন, তাঁর পৃথিবীতে লক্ষের মধ্যে একটাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর যিনি জপ গুণছেন, তাঁর বারো আনাই তিনি নিয়ে গেছেন।

অন্তর্যামিত্বহীন জীবের পক্ষে সব বুঝা এবং বুঝে করা সম্ভব নয়। সমস্ত গণিতের মাঝে এই অমাবস্যা পূর্ণিমা হচ্ছে। গণিতের মাঝেই সব চলেছে।

আমার মত একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি কি করেন?

আমি— যে কিছুই করে না, তারই মুক্তি বিধান করি।

প্রশ্ন— কেন? তা কি করে হয়?

আমি— মানুষের পাপ-পুণ্য মনে মনে। মানুষ নিজের পাপ মুছতে চায়। মনে মনেই সব। মনে মনে চিন্তা করলো, ভগবান খুশী হলেন। এতগুলি দান করলো, ভগবান খুশী হলেন। আমি যদি বলি, এতসব ঝামেলার দরকার কি? মনে মনে চিন্তায় পাপ হয়। যে জায়গায় পাপ-পুণ্য থার্মোমিটারের পারদের মত ওঠানামা করে, আর সেটা যদি শুধু নেমেই থাকে, তবে আর পথ কি? আমি একটা পথ করবো, যার ওঠাও নেই, নামাও নেই।

প্রশ্ন— এটা কি পথ?

আমি— এটা পৃথিবীর পথ। এর নীচুও নেই, উপরও নেই। পৃথিবীটা গোল, শূন্যে ঘুরছে। সমস্ত ফাঁকা জায়গায় দিক নেই। উপরে তাকালে যা দেখছো, নীচে তাকালেও তাই দেখবে। আমরা যদি নীচের দিকে মাথা দেই, তাহলেও সেই ফাঁকাই দেখবো। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি, সেই পৃথিবীর ফাঁকাতে তো সবসময় উপরটা দেখি। পৃথিবী যখন শূন্যে আছে, আমরা শূন্যেরই পথিক। শূন্যের কোন দিক নেই। দিশেহারার মতো আমাদের মধ্যে পাপও নেই পুণ্যও নেই। আমরা আছি শূন্যে।

পৃথিবী যখন শূন্যে আছে, আমরা শূন্যেরই পথিক। শূন্যের কোন দিক নেই। দিশেহারার মতো আমাদের মধ্যে পাপও নেই পুণ্যও নেই। আমরা আছি শূন্যে।

প্রশ্ন— এটা করলে কি হবে?

আমি— মুক্ত হয়ে যাবে। মনে কর, ১১০° তে গেলে মুক্তির পথ। ১১০° তে যাবার যে মেহনৎ, তার অনেক হাঙ্গামা। আর আমি যদি বলে দিই, তোমরা মুক্ত হয়ে এসেছ, এটাই তেমাদের শেষ জীবন। এখানেই আমার গতি, এখানেই আমরা মুক্ত। সুতরাং তাদের পথ আমি সহজ করে দিয়েছি। এই পথ যদি হাজার হাজার পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সকলেই মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। আমরা শূন্যকে শূন্য ব'লে শূন্য পথেই যাত্রা করছি। শূন্যে ফাঁকায় পাপ নেই, পুণ্য নেই, উত্থান নেই, পতন নেই। শূন্যে সকল অবস্থাই



এক অবস্থা। এই এক অবস্থাতে যদি যাওয়া যায়, তবে আর কোন কিছুর দরকার নেই। সকলের একবারে হয়ে যাবে। তারা বলছে, এটাই সহজ পথ। মাছি, মশা কোন্ ব্যক্তি না মারছে? উদ্ধার পেতে গেলে আমাদের এমনই একটি পথ দরকার। এই দেহের সঙ্গেই শেষ, এই জীবনই শেষ। এই মন্ত্রই মনে প্রাণে গেঁথে নিতে হবে। তোমাদের মন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। এই অবস্থা আমি যদি তৈরী করে দিই, তবে তাদের কাউকে আর হোঁচট থেকে হবে না।

প্রশ্ন— তাহলে তো কেউ আর ভগবান মানবে না। দেশ নাস্তিক হয়ে যাবে।

আমি— মানুষ এই যে তীর্থে যায়, কত কষ্ট করে করে পৌঁছায়। আমরা দেখবো ফল। যখন একটা বিরাট বস্তুতে পৌঁছাতে হয়, রাস্তায় কত অসুবিধা হয়। খেজুর গাছে উঠতে হবে, দড়ি দিয়ে উঠছে। উঠার পথ জটিল হলেও ফলটা যদি তাতে পাওয়া যায়, তবে কষ্টটা লাঘব হয়। এখানকার শাস্ত্রগত যে পথ আছে, তাতে আর কারও দেবদর্শন হবে না। আর আমি যে পথ দিচ্ছি, আমার পথ ভগবানের সাথে মিশে যাওয়ার পথ। আমার পথ ভগবানকে দর্শনের পথ। খেয়াল, ঠুংরি গান গাইতে গাইতে যখন বড় ওস্তাদ হয়ে যায়, গানের পদ আর থাকে না আ-আ; তারপর আ-আও থাকে না। মনে মনে সুর আওড়াচ্ছে। এও তাই। কাজেই মন্ত্রের শব্দে সবসময় থাকলে, আমি যদি প্রতিমুহূর্ত্তে মন্ত্রের সুরে সুর দিয়ে যাই, সেটা টেনে নিয়ে যাবে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থানে। তখন বিশ্বের বিরাট সত্তা তোমার মন হয়ে যাবে।

এখানকার শাস্ত্রগত যে পথ আছে, তাতে আর কারও দেবদর্শন হবে না। আর আমি যে পথ দিচ্ছি, আমার পথ ভগবানের সাথে মিশে যাওয়ার পথ। আমার পথ ভগবানকে দর্শনের পথ।

সমস্ত জগৎটাই মন। স্রষ্টা মনন করেছেন, সৃষ্টি হয়ে গেছে। সূর্য মনন করেছে, পৃথিবী হয়ে গেছে। পৃথিবী মনন করেছে, প্রাণী হয়েছে। বিষয়বস্তু সবই মন। এই জগৎটা মনেরই একটা রূপ। জমাট রূপ দেখছো। যেমন জল আর বরফ। সমুদ্রের জল

আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার দিয়েই এখানকার স্বাদ বের করতে হবে। এই স্বাদ হচ্ছে মনের রূপটা বের করা। এটাই সাধনা।

বরফ হয়ে সাগরেই দুলছে। মনের সাগরেই পৃথিবী জমাট হয়ে বরফ আকারে ভাসছে। পৃথিবীর মন প্রাণী আকারে আমরা পৃথিবীতে দুলছি। বটবৃক্ষের বীজ হাতে রাখলে বলতে পারি, বটবৃক্ষ আমার হাতে বীজাকারে। মনেরই একটা সত্তা এই পৃথিবী। জগৎটাই মন। জগৎটাই মন হয়ে বরফ আকারে আমাদের মন সাগরে ভাসছে। সেই বরফ আবার সেই জলে মিশে যায়। আমরাও বরফ আকারে আছি; আবার মিশে যাবো মিশে যাওয়ার পদ্ধতিটা শিখে নিয়ে। তরকারি আছে। জিরা দিয়ে সম্ভার দিচ্ছি। গাছ দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছি। গাছ দিয়েই দেশলাই তৈরী করছি। সবই গাছ হতে, পৃথিবীর বুক হতে। কড়াইটাও পৃথিবীর বুক থেকে। তেল, লবণ সবই পৃথিবীর বুক থেকে। তার উপরই স্বাদ তুলছি। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার দিয়েই এখানকার স্বাদ বের করতে হবে। এই স্বাদ হচ্ছে মনের রূপটা বের করা। এটাই সাধনা। মনের বলে বলীয়ান হয়ে কতটা একত্র হওয়া যায়, একসুরে বাঁধা যায়, তার চেষ্টা করছি। আমরা দেখছি, অতি সহজে কিভাবে কাজ করা যায়, কিভাবে সহজে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু ১৬ নাম ৩২ অক্ষর প্রথম যখন দিলেন, তাতে যে সাড়া পেলেন, তারফলে তিনি তাই দিয়ে গেলেন। সকলে দেখলো, অতি সহজে পাওয়া যায়।

আবার আর একটা পথ আছে। তাতে নামও আছে, কামও (কাজও) আছে। কেবলমাত্র প্রত্যেকের মনে প্রাণে গেঁথে নিতে হবে, আমার এই জীবনটাই শেষ। আমার আর জন্ম নেই। এই মন্ত্রের সুরে যা বের হবে, তাই হবে। এটাই আমার শেষ জীবন।

আমাদের শাস্ত্রগত সাধনার অধ্যায় যেখানে শেষ করছে তারা, আমরা সেখান হতে আরম্ভ করছি। সাধনা করে যেখানে শেষ, আমাদের সেখান হতে শুরু। ডিগ্রী ছাড়াও লেখাপড়া করা যায়। সিদ্ধি, মুক্তি (সাধনা করে) না হলেও ঐ ক্ষমতাটা আয়ত্ত করা যায়। যেমন লণ্ডনে যে যায়, জাহাজে করে গেলে তারা কি জাহাজবাসী হয়ে গেল? লণ্ডনে গিয়ে তো পৌঁছালো। এই যে পড়তে যায়, ব্যারিষ্টারি পড়তে যায়। পত্রিকায় উঠলো, তিনি যাচ্ছেন। আর জাহাজ

আমাদের শাস্ত্রগত সাধনার অধ্যায় যেখানে শেষ করছে তারা, আমরা সেখান হতে আরম্ভ করছি। সাধনা করে যেখানে শেষ; আমাদের সেখান হতে শুরু।



যারা মুছতে মুছতে যায়, তারাও লণ্ডন যাচ্ছে। তাদেরও লণ্ডন যাওয়া হচ্ছে। একটা আইন মতন, ডিগ্রী মতন যাওয়া; সেটা জানিয়ে শুনিয়ে যাওয়া। আর জাহাজ মুছতে মুছতে আরেক ভাবে যাওয়া। আমার কথা হল, দুভাবেই যাওয়া যায়। বিনা টিকিটেই যাক আর লাফিয়ে লাফিয়ে যাক, যাওয়া তো হলো। অত বিধিব্যবস্থা, আইনের মধ্য দিয়ে গেলে পিছলিয়ে যেতে পারে। ঐভাবে সাধনা করে যেতে হলে অনেকেরই হবে না। খালাসীর অভিজ্ঞতা অনেক ব্যারিষ্টারের চেয়ে বেশী। তারা তো সব দেশ দেখে এলো। আমার কথা হল, এই জন্মেই শেষ।

তোমরাও দেখবে, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্ত্তিক সব খেলা করছে। তোমরা একবারেই দেখবে ভগবান। ভগবান দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এই যে দেখে এলে, এটা কি দেখা হল না? খালাসী হয়েই যদি যাও, তবু তো গেলে। আর যজ্ঞ করলো, দাড়ি রাখলো, মা ছাড়লো, বাপ ছাড়লো, তারপর কত সাধ্য সাধনা করে দেখলো ভগবান। জাহাজ মুছতে মুছতে লণ্ডনে যায় যেমন, তেমনিভাবে গিয়ে তোমরা যদি কার্ত্তিক, গণেশ, শিব পেয়ে যাও, তবে তো হয়েই গেল। দর্শনেই যখন বলছে শেষ। আগে গরুর গাড়ী ছিল। এখন প্লেন। আবার হেঁটেও যাওয়া যায়। আর একজন দেশ ভরে হাঁটছেন। বিনোবা ভাবে না কি যেন নাম, তার মত হচ্ছে, আমি হেঁটেই সমস্ত পৃথিবী দেখবো। তিনি আবার ভূ যজ্ঞ না কি যেন করেন। আর যদি সহজভাবে কাজ করতো, কত কাজ করতে পারতো।

যজ্ঞ করলো, দাড়ি রাখলো, মা ছাড়লো, বাপ ছাড়লো, তরপর কত সাধ্য সাধনা করে দেখলো ভগবান।

সাধনায় মন স্থির করবো, গেল চার বছর। ছেলে মেয়ে ছাড়লাম। তারপর সন্ন্যাস। এই করতে করতে ২০ বছর কেটে গেল। তারপর যদি একটু ঝিলিক টিলিক দেয়, দর্শন হয়, ধর ১০৮° ডিগ্রীতে উঠলো। হঠাৎ খড়মের চাপায় একটা আরশোলা মারলো। ধ্যাস্ করে ৯৯° ডিগ্রীতে নেমে গেছে। এত করলো, ঘর ছাড়লো, কত কি করলো, খড়মের

৬৫ বছরের পরমায়ু যখন, এর ভিতরে মা চাইব, বাবাও চাইব, ছেলেও চাইব; স্ত্রী সংসার, ইন্দ্রিয়ও ঠিক থাকবে। সংসারও ঠিক থাকবে, ভগবানও পাওয়া যাবে। তার একমাত্র পথ আমাদের "এই জীবনই শেষ।"

নীচে পড়ে আরশোলা চ্যাপ্টা। একবারে ৯৯° ডিগ্রী। যেখানে কলার বাকলায় আছাড় খেয়ে মরতে হয়ে, সেখানে বড় আছাড় খাওয়াই ভাল। আমাদের কলার বাকলায় আছাড় খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? কথা হল, এই জীবনই শেষ। আমাদের কথা হচ্ছে, অত সমস্ত জটিল পথে না গিয়ে, ৬৫ বছরের পরমায়ু যখন, এর ভিতরে মা চাইব, বাবাও চাইব, ছেলেও চাইব; স্ত্রী সংসার, ইন্দ্রিয়ও ঠিক থাকবে। সংসারও ঠিক থাকবে, ভগবানও পাওয়া যাবে। তার একমাত্র পথ আমাদের ''এই জীবনই শেষ।'' এই মন্ত্রে পাপ পুণ্যের দরকার নেই। আমি শুধু এই সুর দেব, ''এই জীবনই শেষ।'' কিন্তু পরে কোথায় যাবে? এখন জানার প্রয়োজন নাই।

আমাদের স্কুলে (উজানচর কংসনারায়ণ হাইস্কুল, কুমিল্লা) একটা রোগী নিয়ে এসেছিল। মাষ্টারমশাইরা আমাকে বলেন, ভাল করে দিতে হবে। রোগীর পেটটা বড় হয়ে গেছে। আমার তখন অল্প বয়স। আমি দেখলাম, পেটে জল জমে গেছে। ইটা (ইটের টুকরা) দিয়া ঢিল মেরে পেটের জল বের করে দিলাম। বাচ্চা বয়সে স্কুলে একবার স্পোর্টস্ হয়েছিল। হেডমাষ্টার বলেন, 'তোমায় নাম দিতে হবে।' দিলাম নাম। চোখ বেঁধে বাড়ি দিয়ে পাতিল (হাঁড়ি) ভাঙ্গি। তিন চারটা লিলি বিস্কুটের টিন দিল। সবাইকে বিস্কুট বিলিয়ে বাড়ীতে অবশ্য খালি টিনই নিয়ে এসেছি। আর একটায় নাম দিয়েছে দৌড়। মাষ্টারমশায় বলেছেন, 'আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি। তোমার দৌড় দেখবো'।একটা প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছে। বিরাট একটা গোল জায়গায় দৌড়াতে হবে। দৌড় শুরু হতেই, সবাই এক পাক ঘুরতে না ঘুরতেই, আমি দু'পাক দৌড়ে নিয়েছি। তাই সবসময় আমি অন্যদের চেয়ে এক পাক বেশীতে আছি, ওরা চার হলে আমি পাঁচ। ফার্ষ্ট হয়ে গেছি। পুরষ্কার দিয়েছে।

শাস্ত্রগত মন্ত্রের যাবতীয় যা কিছু শেষ করে দিয়ে তারা দর্শন পায়। তোমরা কি পাচ্ছ? গালাগালি, গুরুদেবের নামে মিথ্যা মামলায় হয়রানি। তারা যেভাবে ভগবান পায়, তোমরা পেলে না। জাহাজ মুছতে মুছতেই যাও, আর যেভাবেই যাও লণ্ডনে তো গেলে। ভগবানের দরজায় পৌঁছানো আমাদের কাজ, সিদ্ধি মুক্তির যেখানে শেষ। যে রাজপ্রাসাদে তিনি (ভগবান) আছেন, সেটা খুজে বের করো। তাহলেই সহজ হয়ে যাবে। আজ দেখছো



আজ দেখছো এ্যারোপ্লেন। এরপর এ্যাটোমিক যুগ আসছে। একটা ধাক্কা দেবে, এক মিনিটে দিল্লী। আরও সূক্ষ্ম যুগ আসছে। এখানে একটা বোতামে টান দিলে ঢাকায় নিয়ে ফেলবে। বলছে, এটাও কিছু না। মনটা এইরকম।

এ্যারোপ্লেন। এরপর এ্যাটোমিক যুগ আসছে। একটা ধাক্কা দেবে, এক মিনিটে দিল্লী। আরও সূক্ষ্ম যুগ আসছে। এখানে একটা বোতামে টান দিলে ঢাকায় নিয়ে ফেলবে। বলছে, এটাও কিছু না। মনটা এইরকম। এই একটু চিন্তা করলে মন জগৎ ঘুরে এল। মনের কাছে আকাশ, বাতাস সব সহজ হয়ে গেছে। এটা যে কত বড় ক্ষমতা। এই যে স্পুটনিক, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, মনের কাছে এটা একটা কণা।

শিব শেষবেলায় যখন বুঝলেন, এইখানেই শেষ, আর কিছুর দরকার হবে না, তিনি এখানকার সব কাজকর্ম শেষ করে বসে পড়লেন। এইবার তিনি স্রষ্টার সত্যিকারের সুর খুঁজে পেলেন, মিশে গেলেন। তোমরা একাধারে মন, একাধারে বিভুতি, একাধারে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ বীজ। তোমাদের মধ্যে আছে সেই, অনন্ত জগতের সুর। এটা যেখানে খুশী বাজিয়ে যেতে পার। একবার শেষ থেকে শুরু করছি। একবার আকাশে নিচ্ছি। একবার শূন্যে নিচ্ছি। একবার মন্ত্রে নিচ্ছি। আবার চেষ্টা করছি, তোমাদের বিরাট সুরে বাঁধবার। সেইভাবে যোগাযোগসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছি। এত মধুর, চোখের সামনে এত রূপ দেখছি, এই অপরূপকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি হিতোপদেশ দেই না অন্য সকলের মতো। বেশীর ভাগই তো বলে, নিরামিষ খাবে, হ্যান করবে, ত্যান করবে। আমার কথা হচ্ছে, তোমরা কি কর, আমার দেখার দরকার নেই। বিড়ালকে যদি বল, 'মাছ খাবে না'; তারপর মাছ দেখলেই ''ম্যাঁও''। সে ঠিক খাবে। কোন উপদেশ কাজ করবে না। আমি এরকম উপদেশ দিতে রাজী নই। এগুলো দিয়ে সমূহ গুরুগিরির প্যাঁচে রাখা যায়। এখানে এই ৬০/৬৫ বছরের ব্যাপার। ভিস্তি দিয়ে দেশ ভিজানো যায় না। আমার কথা হচ্ছে, আমি আঢালা প্রেম দিয়ে যাবো। তোমরা আঢালা পেয়ে যাবে। তোমাদের মুক্তি অনিবার্য। এটার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এটাই অভিনব দর্শন। একটা গাভীর দুধ আছে। আবার চোনাও আছে

তোমরা একাধারে মন, একাধারে বিভুতি, একাধারে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ বীজ। তোমাদের মধ্যে আছে সেই, অনন্ত জগতের সুর। এটা যেখানে খুশী বাজিয়ে যেতে পার।

আমি আঢালা প্রেম দিয়ে যাবো। তোমরা আঢালা পেয়ে যাবে। তোমাদের মুক্তি অনিবার্য। এটার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এটাই অভিনব দর্শন।

কাছাকাছি। আবার খুঁজলে, রক্তও পাবে। আমি চাচ্ছি সার (আসল); দুধটা যাতে পাওয়া যায়। এর হিসি (মূত্র) আনলাম, ওর গোবর আনলাম। শাস্ত্রীয় নিয়ম, কানুন — এসবের সময় নাই। গোবর দিয়ে, চোনা দিয়ে ঠাকুরকে স্নান করাবার আর প্রয়োজন নাই। ৬০/৬৫ বছরের ব্যাপার মাত্র তোমাদের। দুই চারশো বছর থাকলে না হয়, কথা ছিল। আমার কথা হচ্ছে, ''ওঠো, বসো, চল।'' ৬০/৬৫ বছর যেখানে পরমায়ু, এখন এসবের সময় নেই। তোমাদের মন্ত্র হচ্ছে, ''এই জীবনই শেষ।''

মূর্ত্তি দেখলে প্রথম প্রথম পাথর চিন্তা করবে। আমার বাড়ীর পাটা পুতা (শিলনোড়া), ইচ্ছা করলে আমি পাথর ভাবতে পারি, কালীও ভাবতে পারি। তোমরা ইচ্ছা করলে ফেলে দিতে পার বা পূজাও করতে পার। একটা পাথরকে আগেই মা কালী বলে ভেবে নেবে না। তাহলে আমরা ঠকে যাব। যে ব্যাটা মূর্ত্তি বানিয়েছে, পা দিয়ে চটকায়। ১০/১২ টা কুলি লাগিয়ে দিল, পাড়ানোর জন্য। কুমোর দেখতে গেল। তার ছেলে নারায়ণ, তারে বলছে, 'পাড়ানোটা ঠিক হয় নাই।' তোমরাই কইবে, ময়ূরটা ঠিক হয় নাই। তারপর দেবীমূর্ত্তিকে উদ্দেশ্য করে বলছে, মা, মা। ব্যাটা তুই পাড়ালি, তুই চট্‌কালি আবার মা, মা। তোমরা দেখবে, মাটি ঠিক আছে। মূর্ত্তি ঠিক আছে। ৩/৪ দিকে চিন্তা করবে। তার চেয়ে বেশী চিন্তা করতে যাবে না। তাহলে ঠকে যাবে। পাথরের মর্ম না জানলে পূজা ঠিক হয় না। মন বসবে না। একজনের বাড়ীতে কত ঘি, পোলাও রান্না হবে। তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়ে বসে আছি। একজন বলছে, কি ভাল দই যাচ্ছিল। এরপর তিন ঘন্টা কেটে গেছে। পেট চোঁ চোঁ করছে। থুথুও শুকিয়ে গেছে, জিহ্বাও শুকিয়ে গেছে। আর একজন এসে বললো, পোলাও এর গন্ধে ম ম করছে। আমি সকাল থেকে শুনতে আছি, ভাল পোলাও, দই, সন্দেশ। কিন্তু এতে কি হবে? শুধু কথাতে পেট ভরে না। দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও বলা যায় এমন কথা।

সেই রাখাল কৃষ্ণ, সেই রাধা। রাধা প্রেম করেছে। এতে তোমাদের কি হলো? এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমাদের ঠ্যাকাটা কি? কিছুই হলো না। মাঝখান থেকে রাত করে বাড়ীতে আসার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রী বকা



শুনলো, পোলারে মারলো। তোমরা এসবে যাবে না।

শুক্‌না প্রেমে কোন কাজ হয়? হ্যাঁ, হয়, যদি এর মর্ম থাকে। আমি এ লাইনে নেই। গীতা ভাগবত পাঠ করলে কি হয়? এটা বিজ্ঞানসম্মত। এই যে পাঠ-টাঠ এরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। এতবড় বস্তা চালের। সিদ্ধির লোভ দেখিয়ে বস্তা মাথায় করিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর সিদ্ধিও দেয়নি, মুটের পয়সাও দেয়নি। তখন বস্তা দিয়ে মারছে, পরে হাসপাতালে। চার আনা বাঁচাতে গিয়ে শেষবেলায় হাসপাতালে পাঁচশো টাকা খরচ। খালি হাতে আমপাতা, জামপাতা, সব শুকনো পাতা নিয়ে কি হবে? ব্যাপারটা হচ্ছে, শুধু কথায় কত হবে? এটা কোন্ খেলা?

সেই রাখাল কৃষ্ণ, সেই রাধা। রাধা প্রেম করেছে। এতে তোমাদের কি হলো? এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমাদের ঠ্যাকাটা কি? কিছুই হলো না। মাঝখান থেকে রাত করে বাড়ীতে আসার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রী বকা শুনলো, পোলারে মারলো।

দেবতার খেলায় এসব চলে। একথাগুলো সব সুন্দর। বিকায় কখন? যখন গাঁথনি (ভিত) ঠিক থাকে। আলপনা দিয়েছে। তিনতলা, চারতলা বিল্ডিং করুম। ফার্নিচার নিয়ে এসেছে, বার্নিশ করবে। সবই হবে ফার্নিচার, বার্নিশ। কিন্তু রাখবে কোথায়? বাড়ীই তো হয়নি। আমার কথা হল, আগে গাঁথনিটা। আরে, লোহা লক্কড়, ফেল, গাঁথনিটা মজবুত করে কর। গাঁথনির কথায় রস কষ নেই। গাঁথনির ব্যাপার মোটেও সুন্দর নয়। আর গাঁথনি পাকা না হলে তলাও হয় না। ভিত্তির (গাঁথনির) কথায় রসটস থাকে না। আমার কথা হল, ভিত্তির কথা। তলা হলে রঙ দাও। এরা গাঁথনি না করে রঙ আনছে, ফার্নিচার আনছে। হিতোপদেশ আমি বলি না। এই যে ঘুড়ি উঠে গোঁত্তা মারে ধ্যাস করে। ঘুড়ি যেখানেই থাক, লাটাইটা যদি ঠিক থাকে, তবেই ঠিক। তত্ত্বের ও গাঁথনির কাজেও তেমনি সব। তোমাদের লাইন তো অন্যরকম। তোমাদের মুক্তি অনিবার্য। কারণ ''তোমাদের এই জীবনই শেষ জীবন।''

ঘুড়ি উঠে গোঁত্তা মারে ধ্যাস করে। ঘুড়ি যেখানেই থাক, লাটাইটা যদি ঠিক থাকে, তবেই ঠিক। তত্ত্বের ও গাঁথনির কাজেও তেমনি সব।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

# ঈশ্বর দর্শনই কেবল সমাধি নয়, চুপ করে বসে থাকাও সমাধি

**শ্যামবাজার, ৪৬নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ**
**০১-০৬-১৯৬১**

সমাধি সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। শাস্ত্রে যে সমাধির কথা বলে জগৎ ব্যাপিয়া প্রতি স্তরে স্তরে জীবজগৎ সমাধির স্তরে আছে। কারণ সমাধি একটা ভাষার নামকরণ মাত্র। জীবনের গতির মাঝে প্রতি স্তরে স্তরে জীব সমাধির স্তর পার হয়ে যাচ্ছে। সমাধি শুধু ঈশ্বর দর্শনই নয়।

মনে একাগ্রতা স্থাপন করে যে ধ্যান হয়, তাতে যে সমাধি, সেটাই শুধু সমাধি নয়। সমাধি কথাটার ব্যাপক অর্থ আছে। সমাধি হচ্ছে এই জগতের সমস্ত অণুতে পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ভিন্ন রূপে যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এই পরিবর্ত্তনের স্তরই হচ্ছে সমাধির স্তর। ঈশ্বর দর্শন বা সমাধি, এটাই কেবল সমাধি নয়। কোন ব্যক্তির চুপ করে থাকাও সমাধি। এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, সেটাও সমাধি। কথাবার্ত্তা বলাও সব সমাধি। দেহের যেকোন পরিবর্ত্তন, সেটাও সমাধি। প্রতিটি সমাধির স্তর কি করে হয়? জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, যেমন রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা, হাঁচি, কাশি, ব্যাধি আর শেষবেলায় শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে মৃত্যু। সেদিন দেহ আর চলে না। স্তরে স্তরে সব সমাধি একত্রিত হলেই হয় মৃত্যু নামক সমাধি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাধিগুলো একত্রিত হয়ে যখন মৃত্যু নামে অভিহিত হয়, সেটাও সমাধি। যে বিষয়বস্তু চিন্তা করছি, তাহাও সমাধির ইঙ্গিত। সেটাও তো সমাধি ছাড়া নয়।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ভিন্ন রূপে যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, এই পরিবর্ত্তনের স্তরই হচ্ছে সমাধির স্তর। ঈশ্বর দর্শন বা সমাধি, এটাই কেবল সমাধি নয়। কোন ব্যক্তির চুপ করে থাকাও সমাধি। এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, সেটাও সমাধি।



একটা একটা পাই পয়সা নিয়ে লক্ষ টাকা। এক পাই বাদ দিলে লক্ষ টাকা হয় না। কাজেই ওই পাই পয়সা লক্ষ টাকা ছাড়া নয়। একটি বালুকণার দাম যেমন কিছু নয়। আবার অগণিত বালুকণা নিয়ে দেশ হয়। একটা বালুকণা দেশ ছাড়া নয়। তাই জীবনযাত্রার মাঝে অগণিত পাই পয়সাতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাধি যখন একত্রিত হয়, তখনই হয় মহাসমাধি। এই জীবনযাত্রার মধ্যে, ক্ষণিকের মধ্যে যাহা হচ্ছে, তাহাও পাই পয়সা সমাধি ছাড়া নয়। রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা প্রভৃতি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দেহকে পরিবর্ত্তনের দিকে নিয়ে গিয়ে একেবারে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চির সমাধিতে নিয়ে যায়। দেহ পচে হোক, গলে হোক রূপান্তরিত হতে থাকে। সেই মাত্রা যে মাত্রাতে মৃত্যু হয়, তা এই দেহেতে Maintain করা যায়। এটা একটা Refrigerator-এর ন্যায় যন্ত্র। কোন্ মাত্রায় বরফ হয়, সেই মাত্রায় আনলে বরফ হয়ে যাবে। সেই রূপ যে মাত্রাতে মৃত্যু হয়, মনের মাঝে সেই মাত্রাটা নিয়ে এলে তখন মনে হয় মৃত্যু সমতুল্য। একজনের পা কেটে ফেললেও যেমন প্রথমে বুঝে না। কারণ বোধশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তার স্তর মৃত্যুর সমতুল্য, যদিও তার শ্বাস প্রশ্বাস আছে। ঔষধের ক্রিয়াতেই যদি এরূপ হয়, ঔষধের ক্রিয়ার ন্যায় দেহেতে যদি ঐ মাত্রার, মৃত্যুর মাত্রার প্রয়োগ হয়, দেহটা টিক টিক করে চলে। আর বাহিরে সব হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় ঐ বিষয়বস্তুর ভিতর সেই মগ্নতার ভিতরে। চরম গভীরতায় যখন চলে যায়, তখন থাকে টিকটিক মাত্র। কিন্তু সেই মাত্রায় মন গিয়ে পৌঁছেছে যে মাত্রাতে মৃত্যু হয়। বাতাস, জল, বায়ু হতে এমন একটি পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, যেটা বিষক্রিয়ার মত ছড়িয়ে গেছে। দেহটা ক্ষণিকের টিক টিক রেখে দিয়েছে শুধু। আর সব মৃতবৎ। সেই যে সমাধি, এই যে হাত-পা ছোঁড়ার অবস্থা, মাঝে মাঝে মাংস যেমন নড়তে থাকে কেটে ফেললেও। মৃত্যুর পর মৃত দেখে তারপর নিয়ে যাচ্ছে। অনেকসময় নড়ে ওঠে। নানারকম বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। সেই যে শিরা উপশিরার টানে শিহরণ বা কম্পন, আবার মাংস কেটে ফেললেও যে কম্পন, তার মানে এই নয় যে, তিনি বেঁচে আছেন। সেই রক্ত ধীর

মৃত্যুর পর মৃত দেখে তারপর নিয়ে যাচ্ছে। অনেকসময় নড়ে ওঠে। নানারকম বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। সেই যে শিরা উপশিরার টানে শিহরণ বা কম্পন, আবার মাংস কেটে ফেললেও যে কম্পন, তার মানে এই নয় যে, তিনি বেঁচে আছেন।

স্থির হয়ে বইতে থাকে।

সমাধি অবস্থায় দেবতাই শুধু দেখে কি? দেবতাই শুধু দেখে না। শুধু ভগবানই দেখে না। কোন্ রহস্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে? যে মাত্রা হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মাত্রার সঙ্গে একমাত্রা হওয়ার জন্য সাধক এগিয়ে চলেছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য সবসময় হাঁ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমি চাই চাই। এই যে চাই চাই করে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই যে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, মিলতির পথে মিল না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই রূপ সেই স্বরূপত্বের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হওয়ার জন্য এইভাবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে।

সংসারে মায়া, মোহ, কাম, কাঞ্চন, এগিয়ে যাবার দিকে হাত পা ছড়ানোর মত, এগুলো হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার যন্ত্র।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# অস্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না, বস্তুর বস্তুত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়

**শ্যামবাজার, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, কোলকাতা**
**০৪-০৮-১৯৫৭**

আজ একজনকে দীক্ষা দিলাম। তাকে আজ্ঞাচক্রে মন রেখে ধ্যান করতে বললাম। সে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলো, 'মূলাধার থেকে না করে প্রথমে একেবারে আজ্ঞাচক্রে চিন্তা করা?

আমি বললাম, হ্যাঁ। গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হলে এই জায়গায় পৌঁছতে অনেকদিন বা জন্ম কেটে যাবে। এখানে নানাজনে ঐভাবে শুরু করেন। দেখো, একটা পিঁপড়েকে ঘরের একোণ থেকে ওকোণ যেতে হলে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে তুমি ১০/১২ বার যাওয়া আসা করে আসতে পারবে। তোমার শক্তি কত বেশী। মূলকে খুঁজে পাওয়া যায় না। অস্তির অস্তিত্ব পাবে না। বস্তুর বস্তুত্ব পাওয়া যায়। বৃহৎ জিনিস কিভাবে চিন্তা করা যায়? একটা শিশু ইংরাজী মোটা বই মুখস্থ করে না। কিন্তু সব কথা কইছে। শিশু বাংলা মোটা বই পড়েনি। গ্রামারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু ভাষা শেখা হয়ে গেছে। আবার ছড়া বলতে পারে। গান গাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক চাপে শিখে গেছে। হঠাৎ সে যেন বই শেষ করে ফেলেছে।

গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হলে এই জায়গায় পৌঁছতে অনেকদিন বা জন্ম কেটে যাবে।

তোমাদের এই পাত্রে অর্থাৎ দেহবীণাযন্ত্রে মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্রের, সহস্রারের যে ভাব বা ভাষা তা আয়ত্ত্ব করতে হবে। মনে কর, লণ্ডনের ভাষা এক, চায়নার ভাষা আরেক। এক বাংলাদেশেরই কত ভাষা। এই দেহেরই স্তরে স্তরে ভাবের ভিতর দিয়ে নানা ভাষা আছে। চিন্তা কর, শোকে, দুঃখে ভাব প্রকাশ একরকম, নানা গতিবিধি, চিৎকারে ভাব প্রকাশ আরেকরকম। এইসব বিভিন্ন অবস্থা ভাব, ভাষা, ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝানো যায়। তোমার এই শিশুর মত পাত্রে যে ভাব ও ভাষা আছে, সেইটাই শিখে তোমার ধাতস্থ

হতে হবে। যেমন শিশু যে দেশে থাকে, সে দেশের ভাষা শিখে ফেলে। তুমি মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্রে যেখানে যাও, সেইভাব শিখে ফেলবে।

আমি একবার একটা বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে একটা শিশু ছিল ও নানান ভাষা জানা বিভিন্ন লোক ছিল। শিশু তাদের কথা শুনছে। কিন্তু কোনটাই শিখে নিতে পারছে না। শুধু তাকায় ও হাসে। ৩/৪ বছর পরে একটু একটু শেখে। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমার পাত্রে না হওয়াটা কঠিন আকার ধারণ করেছে। 'হবে না', 'কি করে হবে?' 'এ জীবনে হবে কি?' ইত্যাদি আনুষঙ্গিকগুলো পারিপার্শ্বিকের চাপে যুগ যুগ ধরে 'হবে না' ভাবটাই চিন্তা করে চলেছে। একজন যোগ অভ্যাস করতে বলছে, আরেকজন কয়, 'আমি পাপী। আমার হবে কি?' আরেকজন কয় (বলে), 'মন বসে না।' তোমার পাত্রটা নানাজনের কথায় এলোমেলো হয়ে গেছে। সেইটাই তোমার ধাতস্থ হয়ে গেছে। এখন তোমাকে শিখতে গেলে এটা সেটা না করে একটা নিয়ে ধাতস্থ হতে হবে। মনে একাগ্রতা আছে বলেই তুমি এটা বলতে পারছো। অসুবিধাটা মেনে নিয়ে এবং ভেবে এটাকেই মনে প্রতিষ্ঠিত করেছ।

একজন যোগ অভ্যাস করতে বলছে, আরেকজন কয়, 'আমি পাপী। আমার হবে কি?' আরেকজন কয় (বলে), 'মন বসে না।' তোমার পাত্রটা নানাজনের কথায় এলোমেলো হয়ে গেছে। সেইটাই তোমার ধাতস্থ হয়ে গেছে।

এক পয়সার মিষ্টি কিনে খেতে গেছি। এখন কামড় দিয়ে দেখি, দাঁতে আঠার মত লেগে গেছে। খোলা যায় না। বাচ্চা শিশু রাস্তায় যা শেখে, তাই এসে বাড়ীতে বলে। ভালমন্দ বোঝে না। বাপ-মায়ের কাছে চড়-টড় খায়। বকুনি খেতে খেতে ধাতস্থ হয়। তখন বোঝে, ওগুলো ছাড়া দরকার। ওসব বলা চলবে না। সমাজে থাকতে গেলে সেইভাবেই নিজেকে গড়ে নিতে হয়। আমরাও নিজের সাধনা দ্বারা নিজের আস্থা গড়ে নিয়েছি। আমরা কই, 'অভিশপ্ত', 'যোগভ্রষ্ট', 'মায়ায় আবদ্ধ', 'লোভ আমাদের আঁকড়ে ধরেছে।' আমরা আঠার মতো আটকে আছি। এসবের বেড়াজালে আমরা আটক হয়ে আছি। কুমোরে পোকা বাসা বানায় ও তাতে নিজেই নিজেকে আবদ্ধ করে মরে।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# প্রভু অমৃতের স্বাদে মানুষ বঞ্চিত। মানুষকে অমৃতের স্বাদের অধিকারী কর

**চম্পানগর, ভাগলপুর, বিহার**
**৩০-১১-১৯৬৯**

দেবর্ষি নারদ একাসনে বসে বসে বেদ চর্চা করছিলেন। বেদ যখন লিখলেন, তিনি বেদের সুর দিচ্ছিলেন। সেই বেদের অর্থ না জানলেও না বুঝলেও শুনলেই মুক্তি হয়ে যায়। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ঝর্ণার পাশে বসে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে এই সন্ধ্যালগ্নে সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বেদচর্চা করছিলেন। তখন বিষ্ণু দেবর্ষিকে আশীর্বাদ করেছিলেন, দেবর্ষি তোমার বেদের অধিকার হয়েছে। তুমি সদাসর্বদা একাসনে বসে বেদের উপাসনা কর, তবেই বেদ তত্ত্বের সন্ধান খুঁজে পাবে। ভগবানের আশীর্বাদ যখন পেয়েছেন তখন দেবর্ষির আর কোন অসুবিধা হল না। বেদের সন্ধান যখন তিনি পেলেন, তখন দেবর্ষি আকাশের দিকে তাকিয়ে বেদ অভ্যাস, বেদ চর্চা করছিলেন। বিষ্ণু দেবর্ষিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিষ্ণু কি আশীর্বাদ করেছিলেন। সে কথা শোন।

সেই আশীর্বাদের বাণীতে ছিল ১১২টা শব্দ - sound (ধ্বনি)। ঐ sound-টাই রোল করে করে তিনি (দেবর্ষি) ওটা (১১২টা শব্দ) দিয়েইবেদ দখল করলেন। তারপর বসে বসে ঐ ১১২টা শব্দ দিয়েই বেদ চর্চা করলেন। তিনি একাসনে এই বিষ্ণুর দিকে, নারায়ণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এইভাবে চর্চা করছিলেন। তাঁর মনে ব্যথা হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, তাই আকুলি বিকুলি করে তাঁর ভিতরকার সবকিছু তত্ত্ব আকাশের সাথে, বাতাসের সাথে মিলিয়ে দিলেন; 'আমার দেহ নেই, মন নেই, কিছু নেই, এই চিন্তা করে সব কিছু সমর্পণ করে তিনি বললেন, হে বায়ু, হে পবন আমার মনকে সবকিছুকে বহন করে তুমি আকাশপথে নিয়ে চলো। তিনি আলোকে বললেন, তুমি

আমার মনকে আকাশপথে বিদ্যুৎগতিতে বিশ্বের সর্বত্র নিয়ে যাও। সমস্ত মনকে আলোময় করে বিশ্বময় নিয়ে যাও। হে চৈতন্যময় ব্রহ্ম, হে সচেতন, তুমি সচেতন হয়ে সমস্ত বিশ্বে বিরাজ কর। আমার চেতনা যেন তোমার সাথে মিলে এক হয়ে থাকে, মিশে যেন এক হয়। আমার এই তত্ত্ব, চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেক যেন মহাবিশ্বে মহামিলনের সাথে চিরমিলনে এক হয়ে থাকে। আমার বেদ একথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমার মধ্যে রয়েছি, আমি তুমি এক। সর্বত্র সর্ব বিষয়বস্তুতে যে তোমার সাথে এক হয়ে রয়েছি, একথা স্মরণ করিয়ে দাও, একথা জানিয়ে দাও। আমি যে তুমি; আর আমি যে বেদ, একথা বুঝিয়ে দাও। আমি আর তুমি যে এক, তুমি আর আমি যে বেদ; বেদ যে আমি আর আমাতে যে বেদ, এর মাঝখানে যে পর্দা রয়েছে আড়াল করে, তা দূর করো, তা খুলে দাও। পিতা পুত্র এক। পিতা পর্দার আড়ালে। পিতা কাঁদছেন, তুমি আমার আমি তোমার। পুত্র চিৎকার করে ডাকছে। মাঝখানে পর্দা সরিয়ে রেখেছে তাদের। পর্দা পিতাপুত্রকে আড়াল করে রেখেছে।

তাই দেবর্ষি প্রার্থনা জানাচ্ছেন বেদকে পিতা পুত্র জ্ঞানে, তোমাতে (বেদ) আমাতে পিতপুত্রের যে সম্পর্ক, এটা করে দাও। তার মধ্যে যে পর্দা, তুমি সরিয়ে নাও। পিতা থাকা সত্ত্বেও আজ এই অবস্থায় আছি যে, আমি আমার পিতাকে দেখতে পারছি না। আমার পিতা থাকা সত্ত্বেও পিতাকে, পরম পিতাকে পাচ্ছি না। কারণ অজ্ঞানতায় অন্ধ হয়ে আছি। দেবর্ষি দুঃখ করে চলেছেন।

মহেশের ছেলে বাপি অন্ধ ব'লে আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) কাছে দুঃখ করছে। আমাকে বলছে, ''বাবা, সবাই চোখে দেখে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমার দর্শন শক্তি দাও। আমার দর্শনের বাধা মুক্ত করে দাও। আমি অজ্ঞান হয়ে আছি। আমার দ্বার খুলে দাও।''

বেদ উত্তর দিচ্ছেন। বেদ দেবর্ষিকে বললেন, হে দেবর্ষি, কত ভাগ্যবান তুমি। আজ দেখতে পারছো না। অজ্ঞান অন্ধকারে রয়েছ। ভিতরের বিরাট আলোতে জীবনের এক বিরাট আলোর পথের পথিক হয়ে যাচ্ছ। বাইরের দিকটা বন্ধ বলে ভিতরের দ্বার খুলে যাচ্ছে। জীবজগৎকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন



রাখা হচ্ছে বান্ধব স্বরূপ। এটা আর কিছু নয়। জীবকে অন্ধকারে রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে ভিতরে সম্পূর্ণ আলোর পথ খোলা থাকে। সেই আলোর পথে যাতে জীব যেতে পারে। তাই সেই পথের পথিক হিসাবে তোমাদের রেখেছি। জীবনের অনেক ঘটনা আছে, যেটা বুঝলে তোমরা যেতে পারবে না। অনেক জানলে, অনেক দেখলে চলতে পারবে না। তাই তোমাদের অন্ধকারে রেখেছি দেবর্ষি, তাই তোমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছি। কিন্তু ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যন্ত্রণায় চক্ষু খুলে যায় অন্তর্নিহিত স্তরে আরও গভীরে, সে নিজেও জানে না। কি করে যায় সেই গভীর স্তরে? সেখানে আশীর্বাদ থাকে বেদতত্ত্বের। সেই স্তরে যখন পৌঁছায়, তখন ভিতরকার পর্দা, ভিতরকার দরজা চক্ষুর মত খুলে যায়। ভিতরের আনন্দে বিভোর হয়ে, আত্মহারা হয়ে জীব তখন বুঝতে পারে যে, চক্ষু থাকলে একাজ হতো না। চক্ষু থাকলে একাজ পারতো না। মনে হয় এটা (দৃষ্টিহীনতা) বুঝি আচ্ছন্নের অবস্থা। কিন্তু এটাই মুক্ত অবস্থা। এই বদ্ধ অবস্থাটাই হচ্ছে মুক্ত অবস্থা। আমি তোমার ভিতরে সব কিছু সব দরজা খুলে রেখে, আবার বন্ধ করে চাবি দিয়ে রেখেছি। যখন আবার চাবি দিয়ে দরজা খোলা হবে, তখন বুঝবে কি বন্ধ আর কি খোলা রয়েছে তোমার জন্য।

তখন দেবর্ষি বললেন, ভগবান তুমি যখন নিজ মুখে একথা বলছো, জীবলোক তো এটা উপলব্ধি করতে পারছে না। জীবতো বুঝছে না যে, তুমি তাদের জন্য এত আশীর্বাদ করে রেখেছো।

বিষ্ণু— আমি দিয়েছি, এটা বুঝবার জন্য। কি দিয়েছি, কেন দিয়েছি, প্রশ্ন কি জাগে না? আমি দিয়েছি যাতে জীবের কল্যাণ হয়। তুমি উপলব্ধি করতে পারছো, তারা বুঝতে পারছে না। আজ বুঝতে পারুক আর না পারুক, একদিন সবাই বুঝতে পারবে, দেবর্ষি। কারণ পথ এমন সুগম ও সহজ, আমাকে (বেদকে) বুঝতে হবেই। যা দেওয়া আছে, পরে আমাকে (বেদকে) বুঝেই চলবে সবাই। তাতেই অনেকে এগিয়ে যাবে।

দেবর্ষি— প্রভু, তুমি এত সুন্দর জিনিস দিয়ে রেখেছ। তাহলে আমাদের এই যে অজ্ঞান অবস্থা, অন্ধ অবস্থা একি আশীর্বাদ?

বিষ্ণু— হ্যাঁ মহা আশীর্বাদ। তুমি এই যে পাথরের সেবা করছো,

শালগ্রামের পূজা করছো; এই শালগ্রামের মত যার নাক নেই, চোখ নেই, তা হতে বাহির হচ্ছে জীবলোকে অজস্র নাক, চোখ, মুখ। তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র নাক, চোখ, মুখ, জিহ্বা আছে অগণিত জীবদেহে। তারা কি করছে, দেখ। তুমি দেখতে পারছো, আর তবে কি তারা দেখে না? তারা দেখে, শোনে, আপন গতিতে দেখে।

প্রশ্ন— প্রভু, কি করে তারা দেখে?

উত্তর — আপন গতিতে আপন সুরে যে তারা বয়ে চলেছে আবহমানকাল হতে। তারা এই যে চলেছে বয়ে, এই যে ঘুরছে আপনগতিতে, কেন? তাদের ভিতর এক অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছে, সেটা চোখে দেখার চেয়ে অদ্ভুত। সেই অনুভূতি ও উপলব্ধিতে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগে এগিয়ে চলেছে তারা; এটাই হচ্ছে যোগ, কুম্ভক, রেচক, প্রাণায়াম যোগ। এই যোগাভ্যাসেই সবকিছু সম্ভব। এই যোগাযোগেই সব সম্ভব।

দেবর্ষিও সব যোগাযোগে সমস্ত অনুভূতি পেয়ে গেলেন, যোগের অনুভূতি পেলেন। তিনি তখন বললেন, আমার অনুভূতির সঙ্গে সকলের অনুভূতি এক হয়ে যাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, চক্ষু থাকিলে, অজ্ঞান অন্ধকার না থাকিলে এ হোত না। তাই ওকে (মহেশের ছেলে বাপীকে) বলেছি, 'তুই চুপ করে থাক। সময় হলে পাবি।'

তোমরা প্রয়োজনে বুঝবে সব, এখন বুঝবে না। তোমরাও সেই স্তরে আছ, সেই বিষয়বস্তু নিয়ে আছ। আবার প্রতিমুহূর্ত্তে দোলায়মান অবস্থায় আছ। দোলায়মান হয়ে চলছো। বসে বসে হাহুতাশ করছো, দুঃখ করছো। বেদ বলছেন, তুমি যেভাবেই থাক, তুমি আমাকে বারবার স্মরণ কর। যেটা তোমার মধ্যে রয়েছে, তাই খনন কর। পৃথিবী খুঁড়লে খনন করলে জল পাওয়া যায়। যে স্রোত মহাসাগরের ন্যায় সর্বদা বয়ে যায় এবং সেইভাবে যে তোমার ভিতর আমিও স্রোতের আকারে current-এর মত সবসময় বয়ে চলেছি, তা স্মরণ কর। সেজন্য খনন কর।

প্রশ্ন— তুমি এভাবে বয়ে চলেছো? আমার (দেবর্ষি) মাঝ দিয়ে যেটা বয়ে যাচ্ছে, সেটা খনন করলেই পাব?



বিষ্ণু— হ্যাঁ। আর তুমি কথা ব'লো না। তুমি কাজে বসো। তাহলেই হবে। তুমি খননের জন্য মনন কর এবং তারপর সেটাকে স্ফূরণ কর এখানে (অনাহতে)। অন্য কোন কথা নয়। ইহা কর্মফল ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করে না। এই এক জীবনেরই কাজের উপর নির্ভর করছে। খনন করলেই এটার স্ফূরণ হয়ে যাবে।

দেবর্ষি— তবে আমি সমস্ত জীবকে ঘরে ঘরে বলে দেব, তোমরা ভেবো না, অজস্র fountain যেমন জলাধারে current-এর মত বয়ে চলেছে, তোমাদের ভিতরও সেই স্রোত অহর্নিশি বয়ে যাচ্ছে।

দেবর্ষি তখন সেই নাম, সেই মন্ত্র ধ্বনি, সেই শব্দ নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বসে অনাহতের চর্চা করতে লাগলেন। শিবকে স্মরণ করে তিনি বললেন, হে অনাহত, তুমি আমার মধ্যে জাগো। বিশুদ্ধের কাছে তিনি বললেন, আমাকে শোধন কর, শুদ্ধ কর, পবিত্র কর। শিবের কাছে বিশেষ করে অনুরোধ (কারণ শিব হচ্ছেন বিষনাশক) করে বললেন, হে প্রভু, আমার দ্বার খুলে দাও। হে প্রভু, তোমার বেদ আমার ভিতর দিয়ে যে বয়ে চলেছে, আমি কেন তা বুঝতে পারবো না?

শিব— এটা কোন কথা নয়। শুধু তোমার ভিতর নয়, সমস্ত জীবলোকের ভিতর, একটি পিপীলিকার ভিতরেও বেদধ্বনি বয়ে চলেছে। তাই সমস্ত জীবের ভিতরেই 'অবতার', 'ভগবান' আছেন। তোমার ভিতর অতি সহজেই বেদের স্ফূরণ হবে, কারণ দেবতার আশীর্বাদ তুমি সহজে পেয়েছো। শুধু তুমি কেন, এই আশীর্বাদ সবাই পেয়ে আছে। তবে পাচ্ছে না কেন? কারণ তোমার Bank-এ টাকা আছে ঠিকই, তুমি নাবালক বলে টাকা তুলতে পারছো না। কিন্তু তুমি সাবালক হওয়ার দিকে। আর কয়েকদিন মাত্র বাকী। এই বাস্তবে ''evil-force'' অনিষ্টকারী শক্তি আছে। কারণ যেখানেই মণি, সেখানেই ফণী। যেখানে আলো, তার পশ্চাতেই অন্ধকার। নিম্নবায় যেমন আছে, ঊর্দ্ধবায়ও আছে। এই বায়ু, পিত্ত, কফ থেকেই শরীর। এই তিনের বিষম গতিতেই মৃত্যু হয়। যেমন পৃথিবী সবাইকে টেনে রাখছে তার আকর্ষণে সবসময়, তেমনি কতগুলি ''evil-force'' যারা টেনে রাখছে সর্বদা। যাতে তুমি নাবালক হতে সাবালকত্বে যেতে না পার, তারা তার চেষ্টা করে।

দেবর্ষি— তারা কে?

বিষ্ণু— তারা evil-force, অনিষ্টকারী শক্তি। বেদতত্ত্বের সন্ধানে যাতে যেতে না পার, অগ্রসর না হতে পার, তার চেষ্টাই তারা করে চলেছে। আবার তারা সমাজের খুব উপকারও করে। গাছে ফুল হয়। গাছময় কাঁটা, ফুল আনতে গেলে কাঁটা ফোটে। মধু আহরণ করতে গেলে মধুকরদের কিছু খোঁচা খেতেই হয়; একটু বিঁধবেই। মৌমাছি দ্বারা মৌচাক বা সমস্ত মধুভাণ্ডটা আবৃত। মধু আনতে গেলে তুমি খোঁচা খাবেই। কারণ সে তার মধু সঞ্চয় ছাড়বে না, আর তুমিও ছাড়বে না। কাজেই আহরণ ও হরণের যুদ্ধ হবেই। তুমি সেই মধু হরণ করবেই। কাজেই লড়াই হবেই। তোমার উপর যেমন, তার উপরও তেমনই আশীর্বাদ রয়েছে মধু রক্ষা করার। তাকেও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কে জিতবে কে হারবে সেটা কথা নয়। যার যার কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে হবে। কৌশল ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে লড়াইয়ে জয়লাভ করো। সেই evil-force যে কখন কার উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, কার ভিতর দিয়ে কাজ করবে, কাকে প্রভাবান্বিত করবে, কাকে attack (আক্রমণ) করবে ঠিক নাই। তা তুমি জান না। দেখা যায়, ভুল বুঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ প্রভৃতি সৃষ্টি করাই এদের কাজ। মায়া, মোহ, কাম, লোভ সাধারণতঃ এসবের ভিতর দিয়েই তারা তাদের কাজ করে। অন্তর্যামিত্বহীন দেশ; কার মনে কি আছে, জানা নেই। অন্তর্যামিত্ব নাই বলেই শুধু বাহিরের আচরণ দিয়ে বুঝতে হয়; কতবড় অন্ধকার। সেটা আমরা সহজে মেনে নিয়েছি। চক্ষু না থাকলে যেমন অবস্থা, অন্ধকারে থাকা অর্থাৎ না জানার অবস্থায় থাকাও সেই একই আচ্ছন্ন অবস্থা।

এই অবস্থা কেন হয়? এই অবস্থা সাধারণতঃ কামের, লোভের, মোহের পথ দিয়ে হয়। কারণ তারা সবসময় আচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করছে। তারা (evil-force) সবসময় ঐ পথ দিয়ে চলছে। কিন্তু কুকুর, বিড়াল এগুলো সহজ করে নিয়েছে। কাজেই অন্য পথ দিয়ে যায় evil-force. অনেকদিনের বন্ধুত্ব। দেখা গেল, একটা কথায় বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে এত ভালবাসা। সামান্য একটা ঘটনায় ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, ভুল বুঝাবুঝিতে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সিঁড়ির উপর দিয়ে দেওয়াল



দিয়ে দিল সাধারণ, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারে। এইগুলি জীবনের অন্তরায়।

বেদ, জ্ঞান, মুক্তি গুরুমুখী। তুমি গুরুমুখী হবে। গুরুগত হবে দেখে আচ্ছন্ন অবস্থা করে রাখে। সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করার মত সদাসর্বদা আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে, যাতে তোমার সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক না হয়। চাঁদের মাধ্যমে, লণ্ঠনের মাধ্যমে আলো যাতে পাও, সরাসরি সূর্যের আলো যাতে না পাও, তার চেষ্টা করবে। এরা (evil-force) গুরুর সাথে যাতে সম্পর্ক না হয়, তারজন্য সবসময় আড়াল দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে। **প্রকৃতি থেকে বাঘ, কুমীর প্রভৃতি প্রতিটি জীবকেই আত্মরক্ষার অস্ত্র দেওয়া আছে। বাঘ, কুমীর তাদের আহারের জন্য শিকার করবেই। দুইয়েরই দাঁত দেওয়া আছে। বাঘের নখ বাঘকে রক্ষা করবে। তোমাকেও সব দেওয়া আছে। বাঘকে আশীর্বাদ দেওয়া আছে। তোমাকেও দেওয়া আছে। আশীর্বাদ, সতর্কতা অবলম্বন করে চললে কেউ কিছু করতে পারবে না। প্রত্যেককে রক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া আছে প্রকৃতি থেকে**। সেই সুযোগই তারা নেবে। যখন অসতর্কতা আসবে, যে মুহূর্ত্তে অসতর্ক হবে, তখনই ওরা (evil-force) ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখনই ওরা নিয়ে নেবে। অসতর্কতার মুহূর্ত্তেই আমরা মরি। বাঘ, কুমীর প্রভৃতি জানোয়াররা (evil-force) তাকিয়ে থাকে কখন তুমি অসতর্ক হবে। অসতর্ক মুহূর্ত্তেই তারা ঘিরে ধরে নানারকম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কারণ তুমি জ্ঞানমুখী হতে চলেছো। তুমি উঠতে যাচ্ছ। তখন যেকোন ভাবে চঞ্চলতা সৃষ্টি করে তোমার অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে চায় না। সে কেবল কৌশলে টেনে আনবে। আবার তোমারও কৌশল জানা আছে। যখন যে অবস্থায় পড়বে, এই যে কৌশল আছে, তোমাকে তা খাটিয়ে চলতে হবে।

এই কৌশল কিভাবে জানা আছে? চুলকানির সময় কাউকে বলতে হয় না, কোথায় চুলকাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই হাত, নখ জায়গা মতন চলে যায়। কাউকে বলতে হয় না, তুমি ঐখানে যাও। তবুও অসতর্কতা এসে যায়। সেইজন্য এই যে বৈষ্ণবদের ফোঁটাকাটা তিলক। রাস্তায় রাস্তায় যেমন CAUTION. সাবধান, সাবধান। 'CAUTION'-এটা হচ্ছে 'সাধু হও সাবধান', এটা যেন মনে থাকে। জীবনের গতিপথ এইভাবে চলছে। আবার

'বেদ' বলছে, আমার Channel-টা, আমার খালটা তোমার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাকে নেওয়ার জন্য বসে আছি। বেদের ঘাটে তরী নিয়ে বসে আছি আমি, কখন তুমি আসবে। নৌকার মাঝি বৈঠা হাতে করে বসে আছে। সে গান গাইছে আর সুর দিচ্ছে। আমাকে পাঠিয়েছে, কখন তুমি আসবে। তোমাকে নেবার জন্য পাঠিয়েছে।

ভগবান বিষ্ণু বলছেন, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে তরী নিয়ে বসে আছি। এখনও তুমি আসছো না? দিন, রাত্র, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে। হে পথিক, এস। তরী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাঝি আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি নিজে এসেছি। হে পথিক, তোমায় বেদের খালে, বেদের সাগরে নিয়ে যাব। এস, এস। আমাদের দেশে মাঝি দণ্ড দ্বারা পার করছে। রাত্র ১২টা হয়ে গিয়েছে। চিৎকার দিচ্ছে, ডাক দিচ্ছে, এস এস। ৬৫ বছর হয়ে গেছে। হে পথিক, তুমি কোথায়? এস এস ৬৬ বৎসর হয়ে আসছে।

ভগবান আবার পাঠিয়েছেন, হে পথিক, এস। আর তো সময় নাই। ভগবান এই তরী পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্যই এই তরী তৈরী আর সেই ব্যক্তি আমরা কি করছি?

একটি সুন্দরী কন্যা, সে এসে বলছে বা চিঠি দিয়েছে, 'না তুমি যেও না। তোমায় আমি চাই। সে কাঁদছে আর বলছে, এস আমরা চলে যাই। তুমি সব ছেড়ে দাও। আমি বাপ, মা সব ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যে আমার প্রাণ। চলো আমরা এক জায়গায় থাকি। আমি তোমায় নিয়ে বাস করবো'।

ছেলে মেয়েকে বলছে, 'চলো, আমরা ভগবানের আরাধনা করি।'

মেয়ে বলছে, 'না, আমরা বিয়ে শাদি করে ঘর সংসার করি। তুমি পাগল হয়ে গেছো।'

ছেলে বলছে, আমি পাগল হই নাই।

ভগবান বলছেন, 'তুমি কি করছো? হে পথিক, কোথায় তুমি ? তোমার বাবাও ৬৫/৬৬-তে চলে গেছেন। তুমিও ৬৬ বৎসরে বসে আছ। আর দেরী করো না, তুমি এস।'



ছেলে পারলো না মেয়ের কথা ফেলতে। মেয়ের টানে বিয়ে করলো। সে ঘর করছে। ঘরে বাবার ফটো, মায়ের ফটো রয়েছে। বিয়ে করতে তারা বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি বিয়েতে যেও না। তুমি যেও না বিয়ে করতে। তবুও গেলাম। তাদের অভিশাপে পরতে হবে বুঝি।

পিতামাতা অপরের কাছে দোষী হতে পারে। পিতা হয়তো বেশ্যাবাড়ী যায়, মদ খায়। কিন্তু যে পিতামাতা বিষ্ণুর অধিকার নিয়ে জন্মায়, তারা বিষ্ণু স্বরূপ সন্তানের কাছে। পিতা মদ খায়, সুঁড়িবাড়ী যায়। বাবা অন্যায় অপরাধ করেছে, সন্তান কাঁদছে, বাবা, তুমি সুস্থ হও।' বাবা সন্তানকে বলছে, 'আমি যা অন্যায় করেছি, তোমরা তা করো না। তুমি ঐপথে (বিপথে) যেও না। যেও না। বাবা এই কথা বলে সন্তানের হাত ধরলেন।

সন্তান যাবেই। সে বাবাকে বলছে, 'তুমিও তো ঐপথে গেছ। তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে।' এই কথা বলে ছেলে চলে গেল হাত ছাড়িয়ে। ছেলে এভাবে বলেছে বলে পিতার মনে লেগেছে। পিতা বললো, হে ভগবান। তুই (ছেলে) আমাকে এভাবে বললি। তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি। আলাদা হয়ে রইলি। পিতা ঘা খেলেন। তার মনে দুঃখ লাগলো। ছেলে আলাদা হয়ে বিয়ে করে সরে গিয়েছে।

যাক্, এখন ছেলের মনের মধ্যে অনুশোচনা জাগছে। সে মনে করছে, তার উপরে পিতার অভিশাপ, মাতার অভিশাপ লেগেছে। স্ত্রী বলছে, 'তোমার বাবা তো মদ খেতেন, চরিত্রহীন ছিলেন।'

ছেলে বললো, পিতা অসৎ কোথায়? তিনি যাই করুন, আমার কাছে তিনি সৎ। পিতামাতা সন্তানের কাছে দেবতুল্য। তাঁরা সন্তানের প্রতি ভুল করেন না। আমি বুঝতে পারছি যে, আমি ভুল করেছি। ৬৫/৬৬ বৎসর পার হয়ে গেছে। ৬৭ হয়ে যাচ্ছে।

মাঝি বলছে চিৎকার করে, 'এস, এস হে পথিক! তুমি কোথায়?

স্ত্রী এদিকে সন্তান সম্ভবা। Hospital-এ স্থান নেই। সন্তান হলো মৃত সন্তান। তখন ছেলে বললো, 'হে প্রভু, আর তো পারছি না। তুমি সব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছ।' বাড়ীতে টাকা নেই, পয়সা নেই। টাকা চুরি করতে

গিয়েছে স্ত্রীকে বাঁচাতে। টাকা চুরি করলো, ধরা পড়লো। বিচারে তার সাজা হলো। এদিকে স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে গেল। সে পড়ে রইলো হাজতে। বয়স তো ৬৮ হতে চললো।

মাঝি বলছে, 'পথিক, তুমি কোথায়? এস, এস।' পথিক তখন হাজতে চোরের সাথে ময়লা টানছে আর বলছে, 'হে ভগবান, রক্ষা কর।'

আবার ঐ আচ্ছন্নে (evil-force) তাকে টেনে নিয়ে আসছে। হঠাৎ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে, বাবা বলছে, 'তুই এখানে? তুই মুক্ত। তুই শুধু নাম কর। তা হলেই হবে।' ঘুম থেকে উঠে সে নাম করতে শুরু করলো। তার ভিতর সব খুলতে আরম্ভ করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল।

সেই দৃশ্যটাই দেবর্ষি বললেন, তোমার কি ৬৯? কেন গো প্রভু?

উত্তর— আর তো তোমার সময় নেই। ৬৯ হয়ে গেল। ভগবান তোমাকে ডাকছেন। তরী নিয়ে ভগবান বসে আছেন। তুমি নাম কর দিবারাত্র দুই বাহু তুলে।

প্রশ্ন— কি নাম আমি করবো? আমি নাম ধাম জানি না। আমি তো খারাপ হয়ে গেছি। নাম ধাম ভুলে গেছি।

বেদ বলছেন, তুমি বার বার স্মরণ কর। দেবর্ষি বারবার বলছে, তুমি নাম কর। ৬৯-এরও একমাস চলে গেছে তোমার। যত শীঘ্র পারো তুমি মাঠে ঘাটে চলে যাও, নাম কর। এছাড়া গতি নেই। ৬৯-ও চলে যাচ্ছে। আর তো বেশী দিন নেই।

তখন সে বলছে, দাও দেবর্ষি, তুমি আমায় নাম দাও।

দেবর্ষি বললেন, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, "শিবশম্ভু"। ৬৯ পার হয়ে গেছে। বয়স ৭০-এ পরিণত হয়েছে। নৌকা ছাড়ছে। পথিক ডাকছে, 'মাঝি, মাঝি, আমার পার করে দাও মাঝি।'

তুমি ঘাটে চিৎকার কর। মাঝির আদেশ ফুরিয়ে গেছে। আবার আদেশ পেলে মাঝি আসবে ও নিয়ে যাবে। তুমি ঘাট ছেড়ে যেও না।



পথিক ভাবলো, 'প্রভু, আমিও ঘাটে আসলাম। তরী ভাসলো? কোন্ পাপে?'

শূন্যগর্ভে মেঘের গুরুগুরু গর্জনে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, বর্ষণ হয়; তেমনই অপূর্ব এক ধ্বনি যেন তার ভিতর আপন মনে বয়ে চলেছে। বেদ হ'তে ওকে (পথিককে) বলছে, পথিক, তোমার আচ্ছন্ন ভাব এখনও কাটেনি। তুমি যে নাম নিয়ে আছ, সেই নাম, সেই সুর নিয়ে বসে থাক ঘাটে। ঘাট ছেড়ো না। সেই মাঝি আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে।

এমন সময় দেবর্ষি এসে বললেন, কি হে, তুমি যেতে পারলে না? তুমি এখনও বসে আছ?

উত্তর— প্রভু, আমিও এসেছি, তরীও ভেসে গেল।

দেবর্ষি— তুমি এসেছো। ওর (মাঝির) আদেশ ফুরিয়ে গেছে। তাই চলে গেছে। তুমি নাম নিয়ে থাক। ঘাট ছেড়ো না। ওর সময় ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই তরী নিয়ে চলে গেছে। তুমি নাম নিয়ে ডুবে থাক। বিষ্ণুর স্মরণে নামে ডুবে থাক।

পথিক ঘাটে বসে নাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর পথিক ঘুমের চোখে দেখছে, নারায়ণ নিজেই তরী নিয়ে এসেছেন। মাঝির নৌকা নারায়ণ নিজেই নিয়ে এলেন।

পথিক বলছে, 'প্রভু, তুমি নিজেই তরী নিয়ে এলে?' বিষ্ণু বলছেন, 'পথিক, তুমি ওঠো। তুমি ৬১ বৎসর ত্রুটি করেছ, অপরাধ করেছ। একদিনও ভালো কাজ করনি। তবে দেবর্ষির স্পর্শে ৭০-এ তোমার দ্বার খুলে গেছে। আমি নিজেই মাঝি, তরী নিয়ে এসেছি। কাজেই এই তরীতে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওঠ এই তরীতে।' পথিক জেগে উঠে দেখে, নারায়ণ নেই, তার তরীও নেই।

সে (পথিক) প্রভুকে ভাবতে ভাবতে, কাঁদতে কাঁদতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। নারায়ণ বলছেন, 'তরী আমার বড় একটু সময় লাগবে।' পথিক আবার জেগে আবার ঘুমিয়ে দেখছে, অপরূপ রূপের মাধ্যমে প্রভু আসছেন তরী বেয়ে।

পথিক বললো, 'প্রভু, তোমার নিজের এত দয়া। জানতাম, তুমি নিষ্ঠুর। প্রভু, তোমায় তো এত মনোযোগ দিয়েও ডাকিনি। তবু এসেছো প্রভু। পথিক দেখছে, নারায়ণ এসেছেন। কি সুন্দর তাঁর হাসি, কি সুন্দর তাঁর রূপ। কি অপরূপ তাঁর রূপ।'

প্রভু— পথিক, ওঠ। আমি এখন মাঝি। পয়সা ছাড়া তো আমি নিতে পারবো না।

পথিক— কি দেবো আমি প্রভু?

প্রভু— দাও কিছু, নইলে তো নিতে পারবো না। যে নাম করছিলে তুমি তাই আবার শুনাও। নইলে তো আমার তরী চলবে না।

অমনি দেবর্ষি ঘাটে এসে উপস্থিত।

দেবর্ষি— প্রভু, অদ্ভুত, অদ্ভুত। সত্যই আমরা বুঝিনা। প্রভু, তুমি এত দয়াল। আমি চিৎকার করে ডাকলেও তুমি আস না। আর অতি ছদ্মবেশে সাধারণ ডাকে তুমি এসে উপস্থিত হয়েছ। ''রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম'' এইভাবে রাম নাম করতে করতে তরী দুলতে দুলতে আপনমনে চলছে। তরী কোথায় যাচ্ছে জানা নেই। নারায়ণই জানেন, কোথায় তরী যাবে।

দেবর্ষি বলছেন, তুমি নাম ছেড়ো না। এই নামেই তরী যাবে সেই ধামে।

প্রভু গলুই-র দিকে তাকিয়ে, পথিকের দিকে তাকিয়ে হাসছেন আর বলছেন, ''নামেই'' আমি, আমিই নাম। তুমি নাম করো, নাম না করলে তরী যাবে না। তোমাকে হাল ধরতে হবে না। তরী হাল মাফিক নিয়ে যাবে। দিক নির্ণয় করতে হবে না। নামই নিয়ে যাবে সেদিকে। তোমার নামই ঠিক করে নেবে দিক।

পথিক— প্রভু নাম আবার কি করবো? তুমিই তো দর্শন দিয়েছ। তোমায় দেখলেই আমার নাম হয়ে যায়। আমার মুক্তির চেয়ে আমার পিতৃপুরুষদের, সমস্ত দেশবাসীর মুক্তি হোক; এই দর্শন, এই অনুভূতি সমস্ত জীবের মধ্যে ফুটে উঠুক, আমি করজোড়ে শুধু এই প্রার্থনাই জানাই। এই তরীতে তোমায় আমি স্পর্শ করি?



প্রভু— দেবর্ষি যে নাম দিয়েছে, সেই নামই নিয়ে নিয়ে চলো তুমি।

পথিক— তুমি যেভাবে দর্শন দিয়েছ প্রভু, জীব বোঝে না। অজ্ঞ জীব বোঝে না। আমি মূর্খ, পাপী, তবুও আজ আমি মুক্ত। তাই প্রার্থনা করি, এই অমৃত স্বাদে মানুষ যে বঞ্চিত, মানুষকে তোমার সেই অমৃতের স্বাদের অধিকারী কর। অমৃতের ভাগী কর সবাইকে। তুমি শুধু এই কর, প্রভু। সমস্ত জীবলোক এই মুক্তির ভাগী হোক।

**নারায়ণ— জানিস্, একবার তরী নিয়ে আমি নিজ হাতে বেয়ে যাই সবার কাছে। প্রত্যেককে বাপ, মা যেমন করে ডাকে, চিৎকার করে আমি ডাকি, তাড়াতাড়ি আয়। জীব যখন আসে না, জীব যখন উঠে না, নিজে দুঃখ পেয়ে চলে যাই। কারণ যারা evil-force, তারা আমারই আশীর্বাদে তাদের আটকিয়ে রাখে। আবার আমার আশীর্বাদ তোমার উপরও রয়েছে। কাজেই আমার হাত বাঁধা এই evil-force-এর নিকট। তাদের কাছে হার মেনে চলে যাই।**

তখন প্রার্থনা জানাল পথিক, প্রভু এখন তোমার দয়া। আমায় জীবলোকে জন্ম দাও। আমি যেন দ্বারে দ্বারে মুক্ত কণ্ঠে তোমার নাম বিলাতে (বিতরণ করতে) পারি। আমি যেন জীব কল্যাণে নাম করতে পারি। তোমার নাম যেন তাদের মুক্ত কণ্ঠে শুনাতে পারি।

প্রভু— হ্যাঁ, যাও তুমি জীব কল্যাণে নাম কর। আমার দুঃখ বড় বেশী। আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। তাদের পিতামাতা মুক্তিদাতা আমি। তবুও যেন অভিশপ্ত আমি। তাদের সেবা করতে পারলাম না। তাদের কাছে মুক্তিদাতা হয়েও যেন অপরাধী হয়ে আছি। তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। এখনই তুমি জীবকল্যাণে যাও। তোমায় জন্ম নিতে হবে না। যাও তুমি দ্বারে দ্বারে। আমি দিয়েছি মুক্ত বস্তু। দ্বারে দ্বারে মুক্ত কণ্ঠে আমারই কথা বলো। মুক্ত কণ্ঠে মুক্ত বীজ ছড়িয়ে যাও। আমি দিয়েছি নাম, জ্ঞান, তত্ত্ব, সুর। বেদের সুর আর আমার সুর যে এক সুর, জানিয়ে দাও জীবলোকে।

তাই দেবর্ষি এই সুর নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু নিজেও ১৬ নাম ৩২ অক্ষর নিয়ে দ্বারে দ্বারে বিলিয়েছেন এই পৃথিবীতে। তাই—

মার খেয়ে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।
হরি হয়ে হরি ভজে গৌর নিত্যানন্দ।
দ্বারে দ্বারে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।

এই ভাবে ১৬ নাম ৩২ অক্ষর নিয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে গেলেন। আবার তারই অর্থ (পরমার্থ) নিয়ে মহাপ্রভু প্রস্তুত হলেন। তিনি কত নির্যাতন সহ্য করেছেন।

**আজও তোমাদের কাছে সেই কথারই কথা বলছি, সাধারণ একজন পথিক হিসাবে। আমি অতি সাধারণভাবে তোমাদের কাছে এসেছি যে কথা নিয়ে, সে দিনের সে কথা আজও বাতাসে আছে। আমি শুনতে পেয়ে আবার এসেছি তোমাদের কাছে। আমার একটি রেডিও যন্ত্র আছে, তাতে জানতে পারি সেই কথা, তাতে বুঝতে পারি, তাই বলি। তোমাদের জীবনের পথ সহজ করে নাও, সরল করে নাও। কাজেই তিনি তরী নিয়ে আসছেন। যাঁকে দেখলে সব জানা হয়ে যায়, সব দেখা হয়ে যায়, সব পাওয়া হয়ে যায়, সব বুঝা হয়ে যায়, তিনি তরী নিয়ে আসছেন। আমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) একজন পথিক হিসাবে জানিয়ে দিয়ে গেলাম, শুনিয়ে দিয়ে গেলাম। আমি আমার পথে, যাওয়ার পথে একথা শুনতে পেলাম। তাই যাবার সময় তোমাদের কাছে শব্দ নিয়ে জ্ঞানের পথে জানিয়ে দিয়ে গেলাম, আজ। মনে রেখো, মনে রেখো।**

ওরা হিন্দীভাষী। আমি হিন্দী জানি না। ওদের একটু বুঝিয়ে দিও।

পরে মহেশ প্রসাদ ঘোষের অন্ধ ছেলে বাপি প্রণাম করে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রার্থনা জানায়, ''আমি আর ধৈর্যহারা হবো না। আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি শুধু আমাকে একবার দর্শন দিও।''

শ্রীশ্রীগুরুদেব (জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ) বলেন, ''তুই সবসময় স্মরণ করিস। দর্শন হয়ে যাবে তোর।''

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# আমাদের গীতা বেদ উপনিষদ সব আমাদের অন্তরে

**নবদ্বীপধাম, নদীয়া**
**০১-০২-১৯৬১**

নবদ্বীপধাম তীর্থ। মনে হল যেন আজকে আমাদের দেশে এসেছি। এই দেশ, এই তীর্থ, এই নাম — সবসময়ে এই নাম প্রচার হয়ে এসেছে। সেই নাম, যে নাম, চৈতন্য মহাপ্রভু জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে দান করে গেছেন। পথে ঘাটে নাম যাচে গৌর নিত্যানন্দ।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মূলনাম ১৬ নাম জপ করলে আপনি স্ফূরণ হয়, আপনি বিকাশ হয়, আপনি প্রকাশ হয়। যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক করাবার সময় নেই। এই নাম নিতে দীক্ষা নিতে পয়সা কড়ি কিছু লাগে না। অর্থের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এদেশে এখন এই নাম বিকৃত করে লোকে ভিক্ষা করছে। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্ব অবস্থায় সবসময় এই নাম জপ করতে পারবে। এই নাম অন্তরে ডাকবে, অন্তরে সাধবে। তাহলে আপনিই অন্তরে সাড়া দেবে। তারজন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু সবসময়ে নাম দিয়ে গেছেন। সেই নাম গেয়ে গেছেন।

এই নাম যাতে সবসময় জাগ্রত থাকে, যাতে সেই নাম সবসময় আমাদের স্মরণে থাকে, তাহার জন্যই স্মরণ করা দরকার। সমস্ত গীতা, বেদ বেদান্ত উপনিষদ কোথায়? আমাদের গীতা বেদ উপনিষদ সব আমাদের অন্তরে। আমাদের এই গীতাকে জাগিয়ে তুলবার জন্য, সেই মহাকৃষ্ণকে জাগাবার জন্যই এই গীতা। আমরা সেই অন্তর গীতাকেই বার বার করে পাঠ করবো, আমাদের অন্তরে যা রয়েছে সাধা ও গাঁথা।

জন্ম মৃত্যু দীক্ষাতে কোন কিছুরই বালাই নাই। এই দীক্ষা নিতে কোন কিছুই লাগে না। যে কোন অবস্থায় সবসময় এই মহানাম জপ করতে পারবে। জপ হচ্ছে এই শ্বাস মণিপুর হতে বিশুদ্ধে আজ্ঞাচক্রে যা অহর্নিশ রয়েছে। কুলকুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে যা জাগ্রত অবস্থায় রয়েছে, তাকেই জাগাবার জন্য এই নাম অহর্নিশ করবে। তাই শ্বাসে প্রশ্বাসে নিতে বলেছে এই নাম। যেখানে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত, সেখানে শুচি অশুচি অপেক্ষা করে না। বন্যার জলে যেমন নালা নর্দমা খাল বিল নদী সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে একাকার করে দেয়, তেমনি এই নামের বন্যায় পাপ পুণ্য, শুচি অশুচি সব একাকার হয়ে যায়। স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রারের সমন্বয়ে রয়েছে এই নাম। এই নামে আছে আদি ক্ষমতা। এই নামে রহিয়াছে অনিমা, লঘিমা, গরিমা। এই নামে রহিয়াছে ভগবত্তা। এই নামে রহিয়াছে সব সত্তা। এই নামে রহিয়াছে বিরাট সত্তা। এই নামে বিরাট সত্তা লুক্কায়িত আছে।

এই ভূগর্ভে বীজ পুঁতলে যেমন গাছ হয়, সেরূপ এই দেহক্ষেত্রে নাম ব্রহ্মবীজ যদি বপন করা যায়, তবে এই নামের বীজ বিরাট আকারে বিশুদ্ধে, আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে ফুটে ওঠে। এই ধ্বনি, যে ধ্বনি হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এই ধ্বনি হচ্ছে নাম, মন্ত্র। এই নাম জপ করলে সব হয়।

নামে কোন বিরোধিতা থাকবে না। ধর্মে কোন দলাদলি থাকবে না। ধর্মে কোন জাতি থাকবে না। এই নবদ্বীপে যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ পালন করা হয়, শুধু তাই নয় যদি আদি উপনিষদ follow করা হয়, আদি বেদকে যদি স্মরণ করা যায়, তবেই স্থাপিত হবে এই সত্যিকারের ধর্ম। তখন এক নাম, এক ধর্ম থাকবে। এই এক নাম এক ধর্ম থাকলে দেশের মানুষ মানুষ হয়ে উঠবে। কেহ কৃষ্ণের কেহ চৈতন্যের ভক্ত; কর্মে থাকবে এক জ্ঞান, এক ভক্তি, এক প্রেম। আজকের দিনে একেকজন একেকটা সাজছে। কেউ ব্রাহ্মণ সাজছে, কেউ অন্য কিছু সাজছে। তার থেকেই ঝগড়া, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। শিব বানাতে গিয়ে বাঁদর বানিয়েছে। এই বিরাট রূপ মহাপ্রভু, তাঁকে শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি রূপে আবদ্ধ করা ঠিক নয়। সূর্য তো জাত বিচার করে না। সূর্য সকল জীবের জন্য; জল, বাতাস, মাটিতো সকলের জন্য। এঁরা তো সর্ব জীবের জন্যই এক। পৃথিবী তো সকল জীবকেই বহন



করছে। সূর্যকে নিয়ে তো কেহ ঝগড়া করে না। তোমরা মহাসাগরের এই মহানামে সব কিছু ভাসিয়ে দেবে। সেখানে কোন নীতিগত বিরোধিতা থাকবে না। যিনি সত্যিকারের সাধনা করবেন, তিনি চেয়ে থাকবেন আকাশের দিকে। মহাকাশের চিদাকাশের মন্ত্র হচ্ছে এই মহামন্ত্র। সেই কৃষ্ণ ভাষাতীত, গুণাতীত, কৃষ্ণের রূপ চিদাকাশ যে গুণাতীত, ভাবাতীত। এই নীল আকাশ চিদাকাশ। তাঁকে রূপের মাঝে এনে যে পূজা করছি, এই পূজাকে যেন আমরা সার্থক করতে পারি। যে ধর্মকে খুঁজে খুঁজে শেষ করা যায় না, তার সত্যিকারের রূপকে যদি জানতে চাই, সেই ধর্মকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদের জাতিগত বিরোধিতা রাখলে চলবে না।

আজ আহারের কষ্ট, আশ্রয়ের কষ্ট, শিক্ষার কষ্ট — এ সবই হচ্ছে ধর্মের বিকৃতির ফল। আমাদের এই ধর্মের বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করে গেল। ধর্ম শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। মুক্তাকাশে মুক্তভাবে মুক্ত মনে ধর্ম বিরাজ করবে। তাকে কণ্ঠির মধ্যে এনেছে কেন? কারণ বিরাট গতির পথে যেমন হাল ধরে চলতে হয়, সেইরূপ আমরা যাতে সেই সমতার সুরকে ধরে এগিয়ে যেতে পারি, তারজন্যই এই ব্যবস্থা। তখন শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তায় যেমন লেখা থাকে CAUTION, কণ্ঠী ও তুলসীও তেমনি সাবধান বাণী। সকল সময় সাবধানতা অবলম্বন করে, সমতা রক্ষা করে যাতে আমরা চলতে পারি, তারজন্যই দেহের মাঝে এই সাবধানতার বাণী বহন করার কথা বলা হয়েছে। তখন এত লেখাপড়া ছিল না। ইন্দ্রিয়গুলি যাতে বিপথগামী না হয়, তাই স্মরণের পথে স্মরণ রাখার জন্য এই বন্ধন। এই জাগতিক বন্ধনে, যেন আবদ্ধ হতে না হয়, তারজন্যই এই বন্ধন। চির মুক্ত হওয়ার জন্যই এই বন্ধন। বন্ধন নয়, যাতে মুক্ত আকাশে এগিয়ে যেতে পারি, তারজন্যই এই আদি বেদ। সুতরাং ধর্ম আজ সংকীর্ণতার মধ্যে থাকার জন্য দেশ, জাতি একে অন্যের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছে। প্রকৃত ধর্মে নীতিগতভাবে জাতিগতভাবে কোন বিরোধিতা থাকবে না। সবকিছুই হবে একে অন্যের পরিপূরক।

আজ আমাদের ধর্মে দলগত বিরোধ। ধর্মের নামে কতগুলি দল, সম্প্রদায় পয়সা রোজগার করছে নিরীহ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে। যে কৃষিকাজ করছে, যে ধাঙ্গরের কাজ করছে, সেও ধর্মের কাজ করছে। ধর্ম

হচ্ছে ভিতরকার সত্তাকে জাগিয়ে তোলা। আজ আমাদের এমনি দুর্দিন যে শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা আরও অবনত হয়ে গেছি। সত্যিকারের ধর্ম থাকবে শুদ্ধ বুদ্ধ। আমাদের সেই সাধনা চাই। ধর্মে থাকবে সকলকে জগতের কাছে বিরাট সুরে পৌঁছে দেবার জন্য সকলের মনের সঙ্গে সত্যিকারের যোগাযোগ। ধর্মে থাকবে সত্যিকারের সকলের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করার মানসিকতা। ধর্মকে সীমাবদ্ধে আনার ফলে আজ দেশের দুর্দিন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে ধর্ম, সেটাই সত্যিকারের ধর্ম। ধর্মে থাকবে একজাত, একধর্ম, এক জ্ঞান, এক প্রেম। আমরা এক সূর্যের আলো, এক পৃথিবীর মাটি, এক বাতাস সবাই গ্রহণ করছি। তবে সকল ধর্ম কেন এক হবে না? এই জগৎ হতে আমরা সবাই আবির্ভূত। কাজেই কোন ভেদাভেদ থাকবে না। একটি পিপীলিকার যে ধর্ম আর মানুষের ধর্ম এক ধর্ম, এক নীতি। ধর্মে দেশাত্মবোধ থাকবে।

আজ ধর্মকে নানারকম পাপ-পুণ্য, অদৃষ্ট আর কর্মফলের দোহাই দিয়ে, নানা খণ্ড খণ্ড চিন্তার মধ্য দিয়ে আমরা সংকীর্ণতার মধ্যে এনে ফেলেছি। আমাদের ধর্মে থাকবে মহাকাশের মূলমন্ত্র, মূলশব্দ, মূলধ্বনি। এর সাতটা সুর আছে। যে সুরকে জানলে সব সুর জানা যায়, সেই সুর জানতে হবে, সেই সুর সাধতে হবে। ABCD অ,আ,ক,খ শিখে যেমন সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করা যায়, 'সা রে গা মা'র ন্যায় এই মহামন্ত্র দেহবীণাযন্ত্রে বাজালে এই পৃথিবীর সব রহস্য আপনি ধরা দেবে, সব সুর আপনি ফুটে উঠবে।

অল্প করে বললাম, ধর্মের কথা। সবসময় জানতে চেষ্টা করবে, ধর্মটা কি? আজ ধর্মের অর্থ বিকৃত হয়ে গেছে। আদিবেদের ভাষ্য, উবাচ, টীকা হতে হতে বেদ কোথায়? সেই 'পতিতে তারিতে হবে তারিণী,' হয়ে গেছে 'পঁচিশে তারিখে হবে বারুণী।' দলগত বিরোধ আর সাম্প্রদায়িকতা এই ধর্মীয় সংকীর্ণতার মূলে। সেই মহানামকে জাগ্রত করার জন্য যা করা দরকার, তাই করা উচিত। এইরূপ যদি সত্যি কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, তবেই প্রকৃত কাজ হয়। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

## অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

| | | *প্রকাশকাল* |
|---|---|---|
| ১) | বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ২) | মৃত্যুর পর | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ৩) | পরপারের কান্ডারী | শুভ বড়দিন, ১৪১১ |
| ৪) | সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১ |
| ৫) | অঙ্গীকার | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২ |
| ৬) | ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২ |
| ৭) | বীজ ও মহাসৃষ্টি | শুভ মহালয়া, ১৪১২ |
| ৮) | শুভ উৎসব | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২ |
| ৯) | তত্ত্বসিন্ধু | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২ |
| ১০) | দেহী বিদেহী | শুভ নববর্ষ, ১৪১৩ |
| ১১) | পথপ্রদর্শক | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩ |
| ১২) | অমৃতের স্বাদ | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩ |

*-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-*

১) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬

২) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯

৩) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*